Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP)

পরিবেশবান্ধব সবজি উৎপাদন সহায়িকা

ইকোলজি বান্ধব নিরাপদ সবজি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প

EMBASSY OF DENMARK

IFAD
Investing in rural people

পরিবেশবান্ধব সবজি উৎপাদন সহায়িকা

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
কাজী আবুল হাসনাত, পিকেএসএফ

সম্পাদনায়
কৃষিবিদ মোঃ রফিজুল ইসলাম মন্ডল, পিকেএসএফ

রচনা ও সংকলনে
মোঃ মিজানুর রহমান, পরামর্শক

কারিগরী সহায়তায়
পিকেএসএফ

অর্থায়নে
ইফাদ এবং ড্যানিডা

প্রকাশকাল: মে ২০২২

মুদ্রণ:
মৈত্রী কমিউনিকেশন
কাঁটাবন, ঢাকা, ০১৯ ৭০ ০৩ ৯০ ৯০

উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
পটভূমি	০৫
১ম পাঠঃ পরিবেশবান্ধব কৃষির প্রেক্ষিত ও পরিধি	০৮
২য় পাটঃ পরিবেশবান্ধব কৃষির উদ্দেশ্য	১১
৩য় পাঠঃ পরিবেশবান্ধব কৃষির মূলনীতি	১২
৪র্থ পাঠঃ পরিবেশবান্ধব কৃষির আদর্শমান বা করণীয়	১৪
৫ম পাঠঃ মাটি কি এবং পরিবেশবান্ধব মাটি তৈরি ও মাটি উন্নতকরণের ধাপসমূহ	১৫
মাটি শোধন ও প্রোবায়োটিকস প্রয়োগ	২১
মাটিতে হিউমাস তৈরি	২৪
মাটি উন্নতকরণ ও মাটির জৈব পদার্থ বাড়ানোর উপায়	২৫
সীম গোত্রীয় শস্য আবাদ ও সবুজ সার তৈরি	২৯
বিভিন্ন জৈব সার তৈরি ও প্রয়োগমাত্রা	৩০
নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশিয়াম সমৃদ্ধ জৈব সার তৈরি	৪২
পরিবেশবান্ধব উপায়ে মাটি তৈরি ও উন্নতকরণ	৪৪
৬ষ্ঠ পাঠঃ মাটির সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ	৪৯
৭ম পাঠঃ কৃষিতে স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	৫২
৮ম পাঠঃ বীজ ব্যবস্থাপনা	৫৩
৮.১. বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ	৫৩
ক. জমি থেকে বিভিন্ন ফসলের বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি	৫৫
খ. স্থানীয় ও উফশী জাতের বীজ সংগ্রহ	৫৫
গ. আঞ্চলিক বীজ সংগ্রহ	৫৮
ঘ. অপ্রচলিত ফসলের বীজ সংগ্রহ	৫৮
ঙ. উচ্চমূল্যের ধান বীজ ও অন্যান্য উচ্চমূল্য শস্য বীজ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ	৫৮
৮.২. ফসল ফলানোর জন্য প্রাকৃতিক উপায়ে বীজ শোধন	৫৯
৮.৩. পরিবেশবান্ধব উপায়ে পরিকল্পিত বীজ বপন	৬২
৮.৪. চন্দ্র ক্ষণ জেনে বীজ বপন (শুক্লা পক্ষ ও কৃষ্ণ পক্ষ)	৬৩
৮.৫. আবহাওয়ার পূর্বাভাস জেনে বীজ ও ফসল বপন	৬৩
৮.৬. বীজ অঙ্কুরোদগমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ টিপস	৬৩
৯ম পাঠঃ পরিবেশবান্ধব শস্য চাষাবাদ পদ্ধতি	৬৫
পরিবেশবান্ধব উপায়ে মাটি শোধন ও জমি প্রস্তুতকরণ	৬৬
প্রাকৃতিকভাবে তৈরিকৃত বীজ সংগ্রহ	৬৭
শস্য বৈচিত্র্যকরণ	৬৭
শস্যপর্যায় অবলম্বন	৭১

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
পালা চাষ	৭২
পয়রা বা উতেরা শস্য চাষ	৭২
শস্য বহুমুখীকরণ ব্যবস্থাপনা	৭৩
সমন্বিত চাষব্যবস্থা	৭৪
আচ্ছাদন ফসল	৭৫
অ-শস্য উদ্ভিদের রক্ষণাবেক্ষণ	৭৬
১০ম পাঠ: ফসলের আন্তঃপরিচর্যা	৮০
অ-কৃষি সঙ্গী তৃণ ও গুল্মের নিয়ন্ত্রণ	৮০
অতিরিক্ত ঘাস বা সাথী ফসল পাতলাকরণ	৮০
ফসলের অতিরিক্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ এবং ফুল-ফল ছাঁটাই	৮১
সেচ ব্যবস্থাপনা ও পানি নিষ্কাশন	৮১
১১তম পাঠ: সমন্বিতভাবে ফসলের রোগ-বালাই ও পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা	৮৪
ফসলের রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনা	৮৪
শস্যের ক্ষতিকর পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণ	৮৫
সমন্বিতভাবে রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনা ও কীট-পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি	৮৮
পোকা-মাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ কমানোর প্রাথমিক ব্যবস্থা	৯০
সমন্বিতভাবে পোকা-মাকড় ও রোগ বালাই দমন পদ্ধতি	৯৬
১২ তম পাঠ: আঞ্চলিক বা স্থানীয় ফসল চাষাবাদ	১১০
১৩ তম পাঠ: মৌসুমভিত্তিক ফসল চাষাবাদ	১১৪
১৪ তম পাঠ: ফসলের মাঠে জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কাজ	১১৫
ক. মাঠে সকল প্রাণির নিরাপদ আবাসস্থল গড়ে তোলা	১১৫
খ. মাঠে জলাধার স্থাপন	১১৫
গ. নালা বা ড্রেইন স্থাপন	১১৫
ঘ. গাছে পাখি বসার জন্য পাখির বাসা বা মাটির হাড়ি স্থাপন	১১৫
১৫ তম পাঠ: ফসলে জৈব উদ্দীপকের ব্যবহার	১১৬
১৬ তম পাঠ: পরিবেশ বান্ধব কৃষির বিধি নিষেধ	১১৮
১৭ তম পাঠ: পরিবেশবান্ধব কৃষির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা	১১৯
১৮ তম পাঠ: ফসল উত্তোলন পূর্ব ও পরবর্তী ব্যবস্থাপনা	১২০
১৯ তম পাঠ: ফসল বাজারজাতকরণে পরিবেশবান্ধব মোড়কের ব্যবহার	১২৩
২০ তম পাঠ: ফসল উৎপাদন ও বিপণন হিসাব লিপিবদ্ধকরণ ছক	১২৪

পটভূমি

পৃথিবীর শুরু থেকেই প্রকৃতি তার নিজস্ব গতিতে প্রবাহমান। মানুষ তার প্রয়োজনে প্রকৃতি থেকে জ্ঞান আহরণ করে এখন সভ্যতার শিখরে বিচরণ করছে। প্রায় বিশ হাজার বছর আগে নারীর হাত ধরে যে আদি কৃষির যাত্রা শুরু তা ছিল সম্পূর্ণ অরণ্যভিত্তিক। এই অরণ্য নির্ভর কৃষিতে কোন কিছুর ঘাটতি ছিলো না বলেই তখনকার কৃষি ছিলো স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ। কালের বিবর্তনে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির দোহাই দিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক কৃষিকে ধীরে ধীরে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। ফলে কৃষি হারিয়েছে তার স্থিতিশীলতা, আমরা হারাতে বসেছি নিরাপদ খাদ্যের সংস্থান। তাই অরণ্যকে নতুন করে গড়ে তুলতে জীব জগত ও গাছপালার সঙ্গে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান যেমন মাটি, পানি, আলো, বায়ু, পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ তথা জীববৈচিত্র্যের পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক সুসংহত করা আমাদের জন্য বড় একটা চ্যালেঞ্জ।

বাংলাদেশ ভৌগলিকভাবেই একটি পলি সমৃদ্ধ বদ্বীপ যেখানে ফসল ফলানো পৃথিবীর বহু দেশের তুলনায় সহজ। আমাদের দেশের কৃষির রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং ঐতিহ্য। যে কারনে বাংলাদেশ সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা সোনার বাংলা হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত। প্রকৃতি ও মাটির জৈবশক্তি নির্ভর কৃষি বাংলাদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক খাদ্যচক্র, বাস্তুসংস্থান, জীববৈচিত্র্য তথা প্রতিবেশ ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। হাজার বছর ধরে এখানকার মাটি, প্রকৃতি, পানি ও জলবায়ুর সঙ্গে তাল রেখেই বিভিন্ন উদ্ভিদ ও ফসলের উদ্ভব হয়ে আসছে। আর এসব ফল-ফসল ছিল শতভাগ নিরাপদ ও পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ। ষাটের দশকের পূর্বে বাংলাদেশের মাটিতে কোন মৌলিক উপাদানের ঘাটতি ছিলনা, কিন্তু অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের জন্য ষাটের দশকে সবুজ বিপ্লবের নামে আধুনিক কৃষিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে আমাদের সমৃদ্ধশালী কৃষি ব্যবস্থা ঐতিহ্য হারাতে শুরু করে। উক্ত সময়ে রাসায়নিক সার, রাসায়নিক কীটনাশক এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি খাদক বামন জাতের বিভিন্ন বীজের আবির্ভাব ঘটে। ১৯৬৪ সন পর্যন্ত আমাদের কৃষিতে কোন প্রকার রাসায়নিক সার ও রাসায়নিক কীটনাশক তথা বিষের উপস্থিতি ছিলো না। কিন্তু তারপর হতেই কৃষিতে নানা পন্থায় রাসায়নিকের প্রবেশ ঘটে এবং তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত রাসায়নিক কৃষিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম মূল রাসায়নিক সার হিসেবে প্রয়োগ হতো। তখন পর্যন্ত অনুখাদ্য হিসেবে সালফার, বোরন, জিঙ্ক, ম্যাগনেশিয়াম এবং ক্যালসিয়াম নামক রাসায়নিক উপাদানগুলি কৃষিতে আলাদা করে ব্যবহার করা হয়নি, কিন্তু পরবর্তী সময়ে মাটিতে এই উপাদানগুলির ঘাটতি দেখা দেয়ায় সেগুলি আলাদাভাবে ব্যবহার শুরু হয়। যার ব্যবহার পরবর্তীতে রাসায়নিক এনপিকে (NPK) সারের সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে ক্রমশ বাড়তে থাকে। বিশ্বে ক্রমবর্ধমান

জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পুরণে অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের জন্যে মাত্রাতিরিক্ত এইসব রাসায়নিক সার, কীটনাশক, রাসায়নিক শস্য ও ফল বৃদ্ধিকারক হরমোন এবং হাইব্রিড বীজ ব্যবহার করায় খাদ্য উৎপাদন সাময়িকভাবে ম্যাজিকের মতো বৃদ্ধি পেলেও তা পরিবেশ, মাটি এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের দেশের কৃষিতে স্থানীয় জাতের বিভিন্ন ফসলের বিপরীতে বিদেশী হাইব্রীড এবং জিএমও ফসল ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করায় রাসায়নিক সার, রাসায়নিক কীটনাশক ও আগাছানাশকের ব্যবহার মাত্রাতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ তলানিতে ঠেকেছে। যেখানে মাটিতে জৈব পদার্থের আদর্শ মান কমপক্ষে ৫.৫% থাকার কথা সেখানে এখন স্থানভেদে ০.৫% থেকে ১.৫% জৈব পদার্থের উপস্থিতি দেখা যায়। ফলশ্রুতিতে আমাদের কৃষির পরিবেশ আজকে সংকটাপন্ন অবস্থায় বিরাজমান।

নির্বিচারে পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতি করে এ ধরনের ধ্বংসাত্মক উৎপাদন প্রক্রিয়া কোনভাবেই টেকসই হবার নয়। পরিবেশ ও প্রকৃতিতে যেভাবে রাসায়নিক বিষ প্রয়োগ করে খাদ্য উৎপাদিত হচ্ছে তাতে প্রতিনিয়ত আমাদের শরীরে খাদ্যের সাথে প্রচুর পরিমাণে বিষ ঢুঁকে পড়ছে এবং মাটি ও পরিবেশ মারাত্মকভাবে দুষিত হচ্ছে। কৃষিকাজে যে পরিমাণ গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গত হয় তার ৪০% আসে রাসায়নিক সার হতে। উল্লেখ্য যে, ২০১৮ সালে সমগ্র পৃথিবীতে 'এনপিকে' (NPK) সারের ব্যবহার হয়েছে ১৮৮ মিলিয়ন মে.টন, এর মধ্যে নাইট্রোজেন সার প্রায় ১০৪ মিলিয়ন মে.টন।[১] অথচ ডাল জাতীয় শস্য বা সীম জাতীয় শস্য (লিগুম ক্রপস) চাষ করলে প্রতি বছর প্রতি একরে অতিরিক্ত ৩০-৬০ কেজি নাইট্রজেন যোগ হয়। এই রাসায়নিক সার ও বিষের প্রভাবে বিভিন্ন খাদ্যে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিকের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে এবং এমনকি মায়ের দুধেও মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক বিষ-এর উপস্থিতি পাওয়া যাচ্ছে।[২] তাই ধরিত্রীকে বাঁচাতে কৃষি ও পরিবেশকে প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী তার বাস্তুতন্ত্র চলমান রেখে কৃষি পণ্য উৎপাদন করা হলে একদিকে যেমন গ্রীণহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমবে অন্য দিকে প্রতিবেশ ব্যবস্থা সুরক্ষা করে নিরাপদ ও টেকসই খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চত করা সম্ভব হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তার পরবর্তীকালে ও আমাদের দেশের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে সকল স্তরের মানুষের কাছে একটা ভাবনার বিষয় ছিলো 'খাদ্য নিরাপত্তা' কিন্তু বর্তমানে এখন আর খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে তেমন চিন্তা নেই, এখন বড় চিন্তা হলো 'নিরাপদ খাদ্য' নিয়ে কারন নিরাপদ খাদ্যের ব্যপ্তি ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে। আমরা যদি এখুনি নিরাপদ খাদ্যের বলয় বড় করতে না পারি তাহলে নিকট ভবিষ্যতে সংকটে পড়বো। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. অমর্ত্য সেন বিশ্বের বড় বড় ৫০টি দুর্ভিক্ষ নিয়ে গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, খাদ্য উৎপাদনের ঘাটতির জন্য কখনও কোন দেশে দুর্ভিক্ষ হয়নি,

[১] STATISTA-2000
[২] Satyamev Jayate, Episode 8,Toxic Food

বরং খাদ্য বন্টনে বৈষম্য ও অসমতা মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গেলে এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। তাই সকলের উচিৎ প্রকৃতিকে খুব সুক্ষ্মভাবে ব্যবহার করে সকলের জন্য স্থায়ীত্বশীল খাদ্য ব্যবস্থা গ্রহণে ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং-এ মনোযোগ দেয়া। আর এই ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং হলো সকল প্রাকৃতিক ফার্মিং-এর চূড়ান্ত রূপ। আমাদের ভূমির বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং-এর শুরুতে তা জৈব বা অর্গানিকভাবে শুরু করতে হবে এবং তা একটা লক্ষিত সময়ে (৩৬-৬০ মাস) ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং-এ রূপান্তরিত করতে হবে।

পরিবেশবান্ধব কৃষির ভিশন: পরিবেশসম্মত উপায়ে নিরাপদ জীবন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ

পরিবেশবান্ধব কৃষির মিশন: প্রচলিত কৃষি জ্ঞানকে সময়োপযোগী করে নিরাপদ কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা

পরিবেশবান্ধব কৃষির লক্ষ্য: পরিবেশবান্ধব সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী স্থিতিশীল কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

এক কথায় বলা যায়: পরিবেশবান্ধব কৃষি হলো প্রকৃতির সাথে ভালোবাসা তৈরি ।

➢ জৈব কৃষি ⟶ ইকোলোজিক্যাল কৃষি/স্থায়ীত্বশীল কৃষি

১ম পাঠ

ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং-এর ধারণা ও বর্তমান প্রেক্ষিত

The Gaia Atlas of planet Management-এর তথ্য মতে পৃথিবীতে ভক্ষণ করা যায় এমন গাছ-গাছালির সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার। এদের বেশিরভাগই হলো Non-husbandry উদ্ভিদজাত খাদ্য ও প্রকৃতির অবদান, যেগুলি প্রকৃতিতে এদের নিজস্ব ও স্বয়ংক্রিয় বাস্তুতন্ত্রে আপনা-আপনিই বেড়ে ওঠে। এসকল উদ্ভিদজাত খাদ্য শুধুমাত্র সংগ্রহ করা ছাড়া মনুষ্য শ্রমের প্রয়োজন হয় না। আবার এই ৮০ হাজার উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে মাত্র ১৫০ টি গাছ-গাছড়া বা শস্য বৃহদাকারে চাষ করা হয়, যার মধ্যে মাত্র ২০% প্রজাতির তৃণ ও উদ্ভিদ মানুষের খাদ্যের যোগান দেয়। মানুষ শুধুমাত্র উদ্ভিদজাত খাবার খায় তা কিন্তু নয়, এর বাইরেও প্রাণি, মৎস্য এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ক্ষেত্র হতে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আহোরণ করে। এখন পর্যন্ত প্রাকৃতিক সম্পদই হলো সকল প্রাণি ও উদ্ভিদের সুস্থায়ী এবং চিরস্থায়ী ব্যবস্থা। এই চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় যখন সম্পদ মজুদের বিষয়টি সংযুক্ত হলো তখন থেকেই ভূমি কর্ষণের যাত্রা শুরু এবং ইকোসিস্টেমের ব্যঘাত ঘটতে থাকলো।

ভারতীয় উপমহাদেশে রাসায়নিক কৃষির ইতিহাস বলা যায় মাত্র ৬০ বছরের। এর পূর্বে হাজার হাজার বছর প্রাকৃতিক কৃষিই পৃথিবীর শুরু থেকে বিদ্যমান ছিল। অথচ উপমহাদেশে ঐতিহ্যবাহী সমৃদ্ধশালী কৃষিতে সবুজ বিপ্লবের নামে আইয়ুব খান এবং সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ষাটের দশকে রাসায়নিক কৃষির প্রচলন শুরু করে। আর এই সুযোগেই অতি মুনাফাভোগী বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর আগ্রাসনে মাত্র ৬০-৬২ বছরে প্রাকৃতিক কৃষিই হয়ে পড়েছে এখন অপ্রচলিত কৃষি। সময়ের পরিক্রমায় বিশ্বে পুঁজির অবাধ প্রবাহ ও বাজার অর্থনীতির প্রভাবে ক্রমবর্ধিত জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশেও ৮০-এর দশক হতে অধিক মুনাফাভিত্তিক কৃষির নামে অবাধে রাসায়নিক সার, কীটনাশক, হরমোন, আগাছানাশক এবং জেনেটিক্যালী মডিফাইড অর্গানিজম ও হাইব্রীড বীজ ব্যবহার করে ফসল উৎপাদন ও বিপণনের ধ্বংসাত্মক নতুন গতি পায়। এ পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন করায় মাটির স্বাস্থ্য বিনষ্টসহ ক্ষতিকর গ্রীণহাউস গ্যাস নির্গমন ও মানুষের স্বাস্থ্যের প্রতি বিরাট হুমকি হিসাবে নানা ধরনের রোগ-ব্যাধি সংক্রামিত হচ্ছে। বিশেষ করে রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক ব্যবহার করে অতি বাণিজ্যিকভাবে একক ফসল উৎপাদন করায় প্রতিবেশ ব্যবস্থা, বাস্তুসংস্থান ও উদ্ভিদ-প্রাণীর মিথস্ক্রিয়ার বৈচিত্র্যতা বিনষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তাই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা টেকসই করাসহ মাটি ও সামগ্রিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনঃআবর্তনশীল করার জন্য ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং পদ্ধতি পৃথিবীর জন্য এখন একটি নতুন বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং এমন একটি কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়া যেখানে একটি নির্দিষ্ট জমির সাথে সম্পৃক্ত জীব (Biotic), জড় (Abiotic) ও ভৌত (Physical) উপাদানের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় মাটির স্বাস্থ্য, জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশের ক্ষতি না করে টেকসইভাবে কাঙ্খিত ফসল উৎপাদন করা হয়। ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং পদ্ধতি ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা এবং মাটির পুষ্টি উপাদান ও স্বাস্থ্য রক্ষায় নির্দিষ্ট কোন একটি পরিবেশের প্রাকৃতিক খাদ্য শৃঙ্খল (ফুড চেইন), খাদ্য তরঙ্গ (ফুড ওয়েভ) ও কোন প্রাণির বাসস্থান এবং প্রজনন প্রক্রিয়াকে কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ করে না। এ প্রক্রিয়ায় স্বয়ংক্রিয় ও টেকসইভাবে একটি বাস্তসংস্থান পরিচালিত হবে এবং বহিঃউৎস হতে কোন প্রকার ক্ষতিকর উপাদান বিশেষত রসায়নিক যৌগ যোগ করতে হয় না। অর্থাৎ ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং এমন একটি উন্নত ও হালনাগাদ ব্যবস্থা যেখানে প্রকৃতিকে খুব সতর্কতার সাথে শুশ্লভাবে ব্যবহার করতে হয়।

পৃথিবী ব্যাপী জৈব কৃষির সাথে ১৮৬ টি দেশের অর্গানিক সনদধারী প্রায় ২.৯ মিলিয়ন কৃষক ৭১.৫ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে স্বীকৃতভাবে জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। পার্শ্ববর্তী দেশে সিকিম নামে একটি রাজ্য সম্পূর্ণভাবে জৈব নির্ভর কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। এই জৈব কৃষিকে সাড়া দুনিয়ায় নানা নামে ডাকা হয়, যেমন- প্রাকৃতিক কৃষি (মাসানবু ফুকুওয়াকা), অর্গানিক বা জৈব কৃষি (স্যার আলবার্ট হাওয়ার্ড), জিরো বাজেট ন্যাচারাল ফার্মিং (ড. সুভাষ পালেকার), আদি কৃষি (ডাঃ ইকবাল আমিনুল কবীর), নিরাপদ কৃষি, শুদ্ধ কৃষি, পবিত্র কৃষি, সুস্থায়ী কৃষি, স্থায়ীত্বশীল কৃষি, ফরেষ্ট বা আরণ্যক কৃষি, ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং। আমাদের বাংলাদেশে আশির দশকে প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে জৈব কৃষির সুচনা করে কিন্তু তা চলমান বা ধরে রাখা সম্ভব হয়নি, পরবর্তীতে Unnayan Bikalper Nitinirdharoni Gobeshona (উবিনিগ) নয়া কৃষি আন্দোলন নামে জৈব কৃষির চর্চা শুরু করে। এরপর নব্বইয়ের দশকের শেষে এসে একজন এমবিবিএস ডাক্তার জনাব ইকবাল আমিনুল কবীর-এর পরামর্শ ও সরাসরি তত্ত্বাবধানে কাজী এন্ড কাজী টি বাংলাদেশে জৈব কৃষির পুনঃজাগরণ ঘটায়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০০৪ সালে কাজী এন্ড কাজী টি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অর্গানিক সার্টিফিকেট অর্জন করে এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য 'চা' বাণিজ্যিকভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানী শুরু করে। পরবর্তীতে স্কয়ার গ্রুপ তাদের উৎপাদিত পণ্য 'চা' আন্তর্জাতিকভাবে অর্গানিক সার্টিফিকেট লাভ করে। এ ছাড়া প্যারামাউন্ট গ্রুপ ২০১২ সালে তাদের টেক্সটাইল মিলে অর্গানিক ক্লথ উৎপাদন শুরু করে এবং পাশাপাশি তাদের কৃষি খামারেও জৈব চাষাবাদের উদ্যোগ শুরু করে। এছাড়াও নব্বইয়ের দশকে বিদেশী সাহায্য সংস্থা এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ-এর অর্থায়নে বেসরকারী সংস্থা কোষ্ট ট্রাষ্ট রিজেনারেটিভ এগ্রিক্যালচার নামে জৈব কৃষির চর্চা করে। তাছাড়া ২০০০ সাল হতে ঝিনাইদহের উন্নয়ন ধারা নামক একটি বেসরকারী সংস্থা বিদেশী দাতা সংস্থার অর্থায়নে জৈব কৃষি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে এবং ২০১৪ সালে

সিলেটের এফআইভিডিবি নামক একটি এনজিও বাংলাদেশে অর্গানিক এবং Participatory Guarantee Systems (পিজিএস) লোগো উন্মোচন করে। এছাড়াও 'তিলোত্তমা অর্গানিক ফার্ম' এবং 'নন্দীনি অর্গানিক ফার্ম' ব্যক্তি উদ্যোগে জৈব কৃষি নিয়ে কাজ করছে। বর্তমানে আরও অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান জৈব চাষাবাদে উদ্যোগী হয়েছেন এর মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিএআরআই) এর Bangladesh Organic Agriculture Network (Boan), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) ও বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে সুদূরপ্রসারী চিন্তা-ভাবনা এবং সহযোগিতা করছে। International Federation of Organic Movement (IFOAM)-এর তথ্য মতে বাংলাদেশে প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) কৃষক জৈব চাষাবাদের সাথে জড়িত। কিন্তু তাদের পণ্যকে জৈব চাষাবাদের কোন স্বীকৃত সার্টিফিকেট দেয়ার মত কর্তৃপক্ষ না থাকায় কৃষক প্রকৃত বাজার মূল্য পাচ্ছেন না। তবে আশার কথা অতি সাম্প্রতিক সময়ে অর্থাৎ গত ৫ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশে Organic Certification in Bangladesh Ltd. (OCB) নামে একটি প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে। বাংলাদেশে সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং কৌশল প্রসারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করলে অদূর ভবিষ্যতে স্বস্তিদায়ক ও টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরি করা সম্ভব হবে।

প্রাকৃতিক কৃষির জনক মাসানবু ফুকুওয়াকা

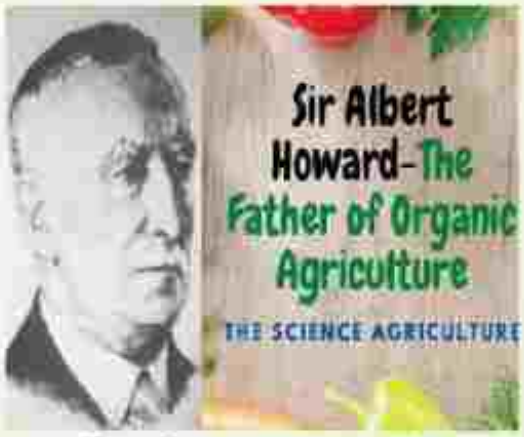

অর্গানিক কৃষির জনক স্যার আলবার্ট হাওয়ার্ড

বাংলাদেশে অর্গানিক কৃষির পথিকৃৎ ডাঃ ইকবাল আমিনুল কবীর

২য় পাঠ

ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং-এর উদ্দেশ্য

এই উপমহাদেশে কৃষিকে সবুজ বিপ্লবের নামে ক্রমশঃ আমরা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছি এবং সাথে আমাদের সমগ্র পরিবেশ ও প্রতিবেশকেও। তাই ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং বা পরিবেশবান্ধব কৃষির উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে আমাদেরকে এগুতে হবে। ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং-এর উদ্দেশ্য হলো-

ক. মাটি ও কৃষি ব্যবস্থাকে তার স্বরূপে ফেরৎ দেয়া;

খ. প্রাকৃতিক কৃষি ব্যবস্থার সাথে যুৎসই ও গ্রহণযোগ্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

গ. কৃষককে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান করে সমৃদ্ধশালীকরণ;

ঘ. পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা;

ঙ. মিশ্র বা সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনায় শস্য চাষাবাদ করা;

চ. স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা;

ছ. পরনির্ভরশীলতা '০' পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া;

জ. দেশীয় বীজ ব্যাংক ও শস্য ভান্ডার গড়ে তোলা;

ঝ. বিলুপ্ত প্রায় দেশীয় প্রজাতির শস্য, মাছ, ফল-মূল উৎপাদনের পরিবেশ তৈরি/ প্রাধান্য প্রদান;

ঞ. ফসলের মাঠকে অরণ্য হিসেবে গড়ে তোলা।

৩য় পাঠ

পরিবেশবান্ধব কৃষির মূলনীতি

প্রকৃতিতে বিদ্যমান সকল প্রাণি ও উদ্ভিদের তথা সকল জীবেরই সমভাবে বাঁচার অধিকার রয়েছে এবং এই ধরনী সেইভাবেই তৈরি। তাই কোন জীবকে এককভাবে ধ্বংস না করে বরং তাদের বেঁচে থাকার অধিকার ও পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। যেমন কৃষি ক্ষেত্রে আমরা একক ফসল চাষাবাদে ফসলি জমিতে যেগুলি আগাছা হিসেবে চিহ্নিতি করে বিভিন্ন আগাছানাশক ছিটিয়ে ধ্বংস করছি, আসলে সেগুলি আদৌ আগাছা কিনা তা কিন্তু আমরা না জেনে-বুঝেই ধ্বংস করছি। তেমনি বিভিন্ন পোকা-মাকড়কে আমরা নির্বিচারে কীটনাশক ছিটিয়ে মেরে ফেলছি সেগুলি আমাদের প্রকৃতির জন্য কতটুকু আশীর্বাদ সেটাও আমরা পুরোটা জানি না। কেননা পৃথিবীতে বিদ্যমান পোকা-মাকড়ের ৯০% প্রকৃতি ও পরিবেশের জন্য উপকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আর সমস্ত পোকা-মাকড়ের মধ্যে ৮৩% হলো মাংসাশী পোকা-মাকড়, ৬% উভয়ভোগী আর ১১% পোকা-মাকড় হলো তৃণ তথা লতা-পাতা বা ফল ভোজী অর্থাৎ যাদেরকে নিরামিষভোজী বলা যায়। আমাদের দৃষ্টিতে এই ১১% পোকা-মাকড় ক্ষতিকর মনে হলেও আসলে তারা উপকারী ঐসব ৮৩% মাংসাশী বন্ধু পোকার খাদ্য হিসেবে বিবেচিত। এজন্য নিম্নলিখিত নীতিগুলো অনুসরণ করা জরুরী।

ভীমরুল

ক. পরিবেশ তথা প্রকৃতিতে যে সকল জীব বিদ্যমান তাদেরকে ধ্বংস না করে সকলের জন্য জীববৈচিত্র্য নিশ্চিত করা এবং তা চলমান রাখা;

খ. স্থানীয় সকল উদ্ভিদ ও প্রাণির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে মাটির উর্বরতা বাড়ানো এবং তা বজায়ে সর্বদা কাজ করা;

গ. সকল উদ্ভিদ ও প্রাণির আবাসস্থল নিশ্চিত করে পোকা-মাকড়ের অবস্থান ও সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা;

ঘ. ফসলে আগাছা হিসেবে কোন কিছু চিহ্নিত না করে মিশ্র ফসল আবাদের মাধ্যমে সঙ্গী তৃণ ও উদ্ভিদের নিয়ন্ত্রণ করা;

ঙ. স্থানীয় পরিবেশ ও জলবায়ু সহনশীল বিভিন্ন স্থানীয় ও আঞ্চলিক বীজ সংরক্ষণ করে প্রান্তিক কৃষকের ঘরে স্থায়ী বীজ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা;

চ. অপ্রয়োজনে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার না করে বিভিন্ন আচ্ছাদন ফসল ও আচ্ছাদন মালামাল দিয়ে ফসল আবাদ করার মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর বজায় রাখা;

ছ. পানির প্রয়োজন হলে ভূ-উপরিস্থ পানি ও বৃষ্টির পানি ধরে রেখে তা ব্যবহার করার মাধ্যমে যেসকল ফসল আবাদ করা যায় তা নির্বাচন করে সেই সব শস্য চাষাবাদ করা;

জ. সকল স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জমির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও যোগান নিশ্চিতকরণ।

৪র্থ পাঠ

পরিবেশবান্ধব কৃষির আদর্শমান বা করনীয়

ইকোলোজিক্যাল কৃষি কাজের শুরুতে অত্যাবশকীয় বিষয় হলো (মাটি তৈরি করার পূর্বে) সংশ্লিষ্ট এলাকার মাটি এবং ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানি অবশ্যই পরীক্ষা করা। কারণ মাটিতে কি কি উপাদান ও পানিতে কি কি খনিজ বা মিনারেলস কোন অবস্থায় আছে তা জানতে হবে। অর্থাৎ কৃষি কাজের শুরুতে সংশ্লিষ্ট এলাকার মাটি ও পানি পরীক্ষা করতেই হবে।

পরিবেশবান্ধব কৃষির আদর্শমান বা করণীয়: যা আবার দুই ভাগে যথাঃ (ক) কি করবো এবং (খ) কি করবো না।

(ক) কি করবো-

- মাটির প্রাণ ফিরিয়ে আনা ও সুরক্ষা দেয়া;
- স্থানীয় ও দেশীয় উন্নত জাতের ফসল বীজ ব্যবহার করা;
- সময়ের ফসল সময়ে বুনা বা বপন করা;
- সর্বদা মিশ্র ফসল চাষাবাদ করা;
- মাটিকে সবসময় কিছুনা কিছু দিয়ে ঢেঁকে রাখা (মালচিং করে রাখা);
- ফসল তোলার সময় ফসলের কিছুটা অংশ জমিতে রেখে দেয়া (বীজ এবং উচ্ছিষ্ট ডালপালা);

(খ) কি করবো না-

- মাটিকে অতিরিক্ত কর্ষণ না করা;
- কোন প্রকার রাসায়নিক কৃষি আর ইকোলোজিক্যাল কৃষি একসাথে বা পাশাপাশি না করা;
- পারত পক্ষে হাইব্রীড জাতের বীজ ব্যবহার না করা;
- জিএমও বীজ একদম ব্যবহার না করা;
- ফোর্স/ জোড় করে ফসল ফলানোর চেষ্টা না করা;
- আগাছানাশক ব্যবহার করা যাবে না (নিষিদ্ধ);
- প্রয়োজন না হলে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার না করা;
- পশু-পাখি নিধন না করা;
- জমিতে শুকনো লতা-পাতা না পোড়ানো;
- অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহৃত পশু-পাখির মল ব্যবহার না করা;

৫ম পাঠ

মাটি কি এবং মাটি শোধন এবং পরিবেশবান্ধব মাটি তৈরি ও মাটি উন্নতকরণের ধাপসমূহ

৫.১.ক. মাটি কি?

খুব সহজ ভাষায় বলা যায়-যা ছাড়া বৃহদাকারে চাষাবাদ করা যায় না তাই হলো মাটি। মা ছাড়া যেমন সন্তান ভূমিষ্ট হয়না, তেমনি মাটি ছাড়া সাধারণত ফসল ফলানো সুবিধার হয়না। সাধারণত মাটি হলো জৈব পদার্থ, খনিজ, পানি ও বাতাসের মিশ্রণ, যেখানে লক্ষ-কোটি জীব ও অনুজীব বা জীবাণুর বসবাস। আর এসব জীবাণু যে সকল মাটিতে সক্রিয়ভাবে বিদ্যমান রয়েছে তাকে সজীব মাটি বলা হয়।

মাটি কি? ভূ-পৃষ্টের সর্বত্র আমরা মাটি দেখতে পাই। কিন্তু জীবের আবির্ভাবের আগে পৃথিবীর কোথাও কোন মাটির অস্তিত্ব ছিলনা। জীবের আবির্ভাবের পর পরই মাটি তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়। যখন উদ্ভিদ ও প্রাণির দেহজাত জৈব পদার্থ বিস্তৃর্ণ পাথরের সঙ্গে মিশ্রিত হল ঠিক তখন থেকে খনিজ, জৈব পদার্থ, পানি, বাতাস ইত্যাদির মধ্যে জৈবিক কর্মকান্ড শুরু হয় এবং তাতে অণুজৈবিক কর্মকান্ডের ফলে হিউমাস তৈরি হতে থাকে। এভাবেই মাটি তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়। যুগ যুগ ধরে মাটির উপরই আমাদের সভ্যতা গড়ে উঠেছে এবং এই মাটিই হলো সভ্যতার চর্চাভূমি ও সভ্যতার ধারক-বাহক।

আবহিকবিকার দ্বারা কঠিন শিলা চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে হাজার বছরে প্রায় ১ ইঞ্চি পরিমাণ মাটি তৈরি হয়েছে, যা কোন মানুষের পক্ষে তৈরি করা অসম্ভব ব্যাপার। অথচ প্রকৃতির অমূল্য সম্পদ এই মাটিকে আমরা নির্বিচারে কলুষিত করছি এবং কর্ষণ করছি, যা কোনভাবেই কাম্য হওয়া উচিৎ নয়।

মাটিকে বলা হয় 'মা' যার মাধ্যমে উৎপাদিত হয় বিভিন্ন পশু-প্রাণির খাদ্য ও নানা প্রয়োজনীয় বস্তু। মাটি হলো উদ্ভিদকে অবলম্বন দেওয়া, উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি-উপাদান (পানি, বাতাস, বিভিন্ন অনু খাদ্য) ইত্যাদি ধারণ ও তা সরবরাহ করে উদ্ভিদ ও প্রাণি জন্মানোর উপযোগি অবস্থা তৈরি করার বস্তু। আর এই তিনটি গুন উৎকৃষ্ট মাটিতে বিদ্যমান। কৃষকদের ধারণায় কালচে বর্ণের নরম ও ঝুরঝুরে এবং কেঁচো সহ অন্যান্য অণুজীবে সমৃদ্ধ মাটিই হলো উৎকৃষ্ট মাটি।

মাটিতে সাধারণতঃ খনিজ, বাতাস, পানি এবং জৈব পদার্থ থাকে। মাটি ভালো কি মন্দ তা এই উপাদানগুলির পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। মাটির আবার বিভিন্ন স্তর বিদ্যমান। মাটির স্তরগুলির মধ্যে উপরের স্তরের একটা অংশকে টপ সয়েল বলা হয়, যা আবার জৈব পদার্থ দ্বারা সমৃদ্ধ এবং মাটির এই উপরিভাগের উপরই কৃষি নির্ভরশীল। জৈব পদার্থের

বিয়োজনের ফলে মাটিতে এক সুস্থায়ী পদার্থ হিউমাস উৎপন্ন হয়। তখন জীবানুর দ্বারা এর বিয়োজন সম্ভবপর হয় না। আদর্শ মাটিতে কমপক্ষে ৫ থেকে ৫.৫% জৈব পদার্থ থাকার কথা কিন্তু আমাদের দেশের মাটিতে তা রয়েছে ০.৫% থেকে সর্বোচ্চ ১.৫%।

কোথাও কোন জলাধার খনন করার সময় মাটির বিভিন্ন স্তরগুলি আলাদা আলাদা রঙ দেখে বুঝা যায়। মাটি অনুযায়ী বিভিন্ন পলিকণা, কাদাকণা, বালিকণার সাথে নানা প্রকার খনিজ যৌগ হিসেবে পাওয়া যায়। তাছাড়া মাটিতে বিভিন্ন জীব, অনুজীব, জীবাণু, ছত্রাক, কৃমি (নেমাটোড) ইত্যাদি থাকে। সুগঠিত মাটিতে সাধারণত খনিজ ৪৫%, বাতাস ২৫% ,পানি ২৫% এবং জৈব পদার্থ ৫% থাকে।

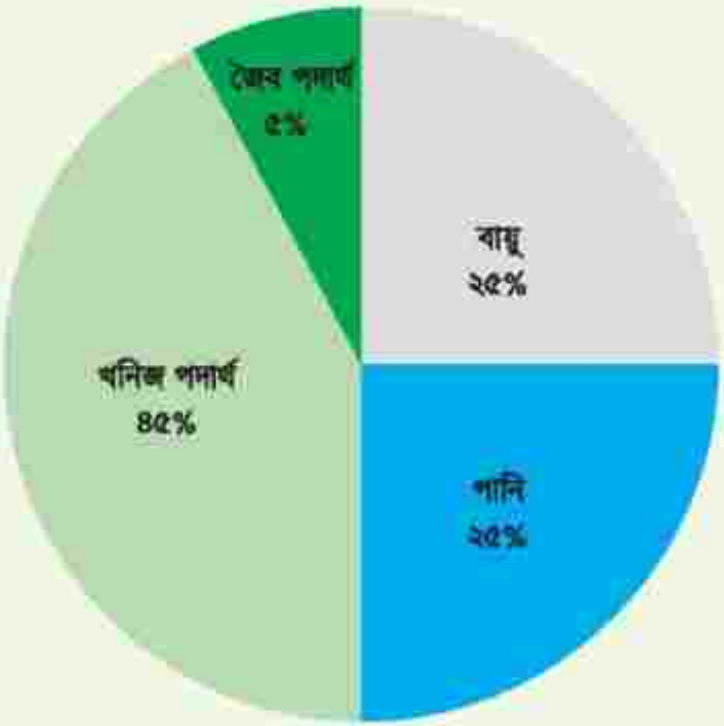

সুগঠিত মাটির উপাদানসমূহ

বৈজ্ঞানিকভাবে দেখা যায় উদ্ভিদ বেশিরভাগ খাদ্য (৯৫ থেকে ৯৬%) বায়ুমন্ডল থেকে সংগ্রহ করে। মাত্র ৪-৫% খাবার মাটি থেকে নেয়। মাটি থেকে বেশি পরিমাণে খাবার উদ্ভিদ গ্রহণ না করলেও খাবার গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা মাটিই করে। অর্থাৎ জৈব পদার্থ থেকেই উৎপন্ন বিভিন্ন জৈব আয়নের মাধ্যমে উদ্ভিদ খাদ্য গ্রহণ করে।

রাসায়নিক কৃষিতে প্রচুর রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে মাটির স্বাভাবিক সত্ত্বা বজায় থাকে না জন্য দিন দিন মাটি অনুর্বর হয় এবং গাছের খাদ্য সংকট হয়ে যায়। একটা কথা মানতেই হবে রাসায়নিক সার কিন্তু মাটির খাবার নয় ইহা গাছের খাবার। আর গাছের খাবারের পাত্রই আমরা ধ্বংস করে ফেলছি, তাই মাটির এই বিশাল সম্ভারকেই বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যবহার করতে হবে।

সারণী নং-১, উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় ১৬ টি খাদ্য উপাদান ও তার উৎসসমূহ:

ক্র. নং	মৌলের নাম	শতকরা পরিমাণ	উদ্ভিদ খাবার কিভাবে গ্রহণ করে	উৎস
১	কার্বন (HCO_3)	৪৪%	কার্বন ডাইঅক্সাইড সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে	বায়ুমন্ডল
২	অক্সিজেন O_2	৪৪%	পানি ও জলীয় বাষ্প সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে	বায়ুমন্ডল
৩	হাইড্রোজেন OH, H^+	৬%	পানি ও অন্যান্য ঋণাত্বক আয়নের সঙ্গে সালোকসংশ্লেষণ পদ্ধতি	বায়ুমন্ডল
৪	নাইট্রোজেন $NO3^{-1}$, NH_4^{+1}	১-৪%	নাইট্রেট আয়ন অ্যামোনিয়াম আয়ন মৃত্তিকা স্থিত বিভিন্ন জীবানু উদ্ভিদ খাদ্য গ্রহণযোগ্য করে দেয়।	বায়ুমন্ডল, বজ্রপাত, মৃত্তিকা, শিকড়ের অর্বুদ
৫	পটাশিয়াম K^{+1}	০.১-২.৫%	আয়ন মৃত্তিকা দ্রবণ থেকে ঋণ নিয়ে উদ্ভিদের দেহাবশেষ থেকে জমিতে ফিরে যায়।	মৃত্তিকা মাটিতে গচ্ছিত থাকে ২০-২৮ টন/হেক্টরে এবং বিভিন্ন অনুজীব দ্বারা গচ্ছিত থাকে ৬০ কেজি/হেক্টরে।
৬	ক্যালসিয়াম Ca^{+2}	০.১-৩%	আয়ন-আয়ন বিনিময় প্রথা, অম্লজমিতে অনুকূল আবহাওয়ায়, শিকড় ও অনুজীব দ্বারা ক্যালসিয়াম খনিজ বিচূর্ণকরণ ক্ষারীয় জমিতে ডিকার্বোনেশন হয় অনুজীব দ্বারা	প্রতি হেক্টর জমিতে ১৫-১২০০টন পর্যন্ত থাকতে পারে, হিউমাসে ৩০০ কেজি থেকে ৩ টন
৭	ম্যাগনেশিয়াম Mg^{+2}	০.১-০.৯%	আয়ন-আয়ন বিনিময় প্রথা জীবাণু দ্বারা জারণ	প্রতি হেক্টর জমিতে ৩০০ কেজি থেকে ৩ টন পর্যন্ত থাকতে পারে
৮	ফসফরাস $H_2PO_4^{-2}$ HPO_4^{-2}	০.১-০.৯	ফসফেট আয়ন,মৃত্তিকায় আবদ্ধ ফসফেট জীবাণু ও মাইক্রোরাইজা দ্বারা গ্রহণযোগ্য হয়, হিউমাস থেকেও যায়	প্রতি হেক্টর জমিতে মাত্র ২-৩% ফসফেট উদ্ভিদের জন্য সহজলভ্য হয়। ৬০০ কেজি থেকে ১৫ টন পর্যন্ত থাকতে পারে। হিউমাস থেকে ১৫০-১.৫ পর্যন্ত পাওয়া যায়।

ক্র. নং	মৌলের নাম	শতকরা পরিমাণ	উদ্ভিদ খাবার কিভাবে গ্রহণ করে	উৎস
৯	সালফার SO_4^{-2}	০.১-০.৫	ফেট আয়ন, মৃত্তিকা জীবানু দ্বারা ফার জারণ, জীবাণু দ্বারা হিউমাসের খনিজকরণ	প্রতি হেক্টর জমিতে ৩০০-৯০০কেজি এবং হিউমাসে ১২০ কেজি-১.২ টন, বায়ুদুষণের দ্বারা ১০-১০ কেজি। পাতার মাধ্যমে অম্লবৃষ্টির মাধ্যমে
	অনুখাদ্য			
১০	ক্লোরিন Cl	০.১-০.৯	আয়ন। বিভিন্ন লবন থেকে, পটাশের মত 'ঋণ' হিসেবে মৃত্তিকা থেকে উদ্ভিদ আহরণ করে। উদ্ভিদের দেহাবশেষ থেকে আবার মৃত্তিকায় ফেরৎ যায়।	প্রতি হেক্টর জমিতে ৩০০-৬০০কেজি থাকে। জীবানু দ্বারা ৩০-৬০ কেজি পর্যন্ত থাকতে পারে
১১	লোহা Fe	৫০০ পিপিএম (পিপিএম= পার্টস পার মিলিয়ন) ১মিগ্রাম/১লি তরলে= ১ppm)	আয়ন (ফেরাস ও ফেরিক) মৃত্তিকার লোহা চিলেট জীবানু দ্বারা -হিউমাস থেকে লোহার নির্গমন।	প্রতি হেক্টর জমিতে ২০-৬০০কেজি থাকে এবং হিউমাসে ৩-১৫ কেজি পর্যন্ত থাকতে পারে
১২	বোরন BO_4^{-3}	৫০০ পিপিএম	বোরন আয়ন মাটিতে বোরনের চিলেটেড যৌগ হিউমাস থেকে বোরন মুক্তকরণ	প্রতি হেক্টর জমিতে ৩০-৩০০ কেজি থাকে এবং হিউমাসে ৩-১৫ কেজি পর্যন্ত থাকতে পারে
১৩	ম্যাঙ্গানিজ Mn^{+2}	৫০০ পিপিএম	আয়ন চিলিটেড ও যৌগ অনুজীব দ্বারা হিউমাস থেকে ম্যাঙ্গানিজ মুক্তকরণ	প্রতি হেক্টর জমিতে ৩০০ কেজি থেকে ১৫টন এবং হিউমাসে ১-৫ কেজি পর্যন্ত থাকতে পারে
১৪	তামা Cu^{+2}	২০ পিপিএম	আয়ন চিলিটেড ও যৌগ অনুজীব দ্বারা হিউমাস থেকে তামা মুক্তকরণ	জমিতে ৩-৩০০ কেজি প্রতি হেক্টরে এবং হিউমাস থেকে ১-৫ কেজি।
১৫	জিঙ্ক Zn^{+}	২০ পিপিএম	আয়ন চিলিটেড ও যৌগ অনুজীব দ্বারা হিউমাস থেকে জিঙ্ক মুক্তকরণ	জমিতে ৩০-১৫০০ কেজি প্রতি হেক্টরে এবং হিউমাস থেকে ২০ কেজি পাওয়া যায়
১৬	মলিবডেনাম Mo	১ পিপিএম	আয়ন চিলিটেড ও যৌগ অনুজীব দ্বারা হিউমাস থেকে মলিবডেনাম মুক্তকরণ	জমিতে ৩-৩০ কেজি প্রতি হেক্টরে এবং হিউমাস থেকে ১ কেজি।

সূত্র: Bernard Declercq,2002,:he Real Need of Plants,Organic Farming Reader, Eds Claude Alvares et al and others India Press, pp 100

৫.১.খ. মাটির জটিল খাদ্য যোগান পদ্ধতি:

আমাদের প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধরনের গাছপালার সহাবস্থান দেখি যা আমরা কেউ রোপন করিনি। দেখুন পাহাড়ের গভীর জঙ্গল বা সুন্দরবনে মনুষ্য কোন সার, বিষ, পানি, কর্ষণ, পরিচর্চার প্রয়োজন হয়না। কিন্তু গাছপালা ও বিভিন্ন প্রাণি সুরক্ষা পেয়ে যাচ্ছে। এখানে সম্পূর্ণ একটা অগোছালো পদ্ধতি মনে হয়। আসলে প্রকৃতির বুননটাই এরকম। এখানে পোকা-মাকড়ের আক্রমণের ভয় নাই, ফসল প্রতিযোগিতার ধারনাও কার্যকর নয়। জৈবিক উৎপাদনশীলতার ঘাটতিও নেই এমনকি গাছপালার বৃদ্ধিও কোন অংশেই অগ্রহণযোগ্য নয়।

সুন্দরবন

মাটির খাদ্য যোগান দেয়ার পদ্ধতি বড়ই জটিল ও রহস্যময়। এখনও এই রহস্য পুরোপুরি জানা সম্ভব হয়নি। পলিমাটিতে উদ্ভিদের শিকড়ের চারপাশে খাদ্য যোগান দেয়ার জন্য কর্দম কণার পরিমাণ বেড়ে যায়। আবার এঁটেল মাটিতে উদ্ভিদ শিকড়ের সাহায্যে এক ধরণের রস নিঃসরনের মাধ্যমে শিকড় বৃদ্ধির উপযোগি করে তোলে।

উদ্ভিদের দেহ বিশ্লেষণ করলে দেখা তাতে ৬০ রকমের মৌলের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। যদিও আমরা জেনেছি সাধারণত ১৭ টি খাবার উদ্ভিদ গ্রহণ করে। বাকি মৌলগুলির সাথে জানা ও প্রতিষ্ঠিত মৌলের কি বিক্রিয়া তা এখনও অজানা রহস্য। যেমন দেখুন ধান জাতীয় উদ্ভিদ মাটি থেকে সিলিকন গ্রহণ করে তার পাতাকে খরখরে করে তোলে আবার তাতে নাইট্রোজেন জাতীয় রাসায়নিক প্রয়োগ করা হলে তা সিলিকনের ক্ষমতা হ্রাস করে। যার ফলে ধান গাছ কিছুটা নরম ও রোগপ্রবণ হয়ে পড়ে।

সূত্রঃ (ক্যালট, জি ১৯৮২ Lets Intractiones soil racevi INRA(Eds) Organic Farming Reader (Ed Alveras Claude) DPI, Goa.) পৃ-২৭১-২৯৯ (১৪ নং সূত্র থেকে গৃহীত)

৫.১. গ. মাটিতে অনুজীবের বিভিন্নতা:

মাটির বিভিন্ন অণুজীব, ছত্রাক, জীবাণু, আকটিনোমাইসেটিস, কৃমি বা নেমাটোড নিয়েই মাটির মোট অনুজীব। মাটি ও আবহাওয়া অনুযায়ী ঐসব অনুজীবের তারতম্য হতে পারে। ১ গ্রাম মাটিতে প্রায় কোটি খানেক বিভিন্ন জীবাণু থাকে। এখানে আপাতত দৃষ্টিতে উপকারী ও অপকারী অণুজীবের সহাবস্থান অনেকের কাছে অনর্থক কিন্তু তাই বলে সব অপকারী জীবাণু ধ্বংস করা প্রকৃতি বিরোধি। যা আমরা ভাবছি অপকারী তা আবার অন্যকিছুর জন্য ভীষণ দরকারী। কারণ জীবাণুর বংশবৃদ্ধি ও মৃত্যু যুগপৎ চলে। প্রতিকূল আবহাওয়ায় বংশবৃদ্ধির হার কমে কিন্তু আবার প্রতিকূল অবস্থায় স্পোর অবস্থার অনেক দিন থাকে যা আবার অনুকূল পরিবেশে বংশবৃদ্ধি করে।

আমাদের মোট অনুজীব জৈব বৈচিত্রের মাত্র ১০% কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা যায়। তাহলে ৯০% জীবাণু অজানা রহস্য নিয়ে জীববৈচিত্র্যে অবদান রাখছে। জেফ লোয়েনফেস ও ওয়াইনে লিউস বলেছেন যে, চাষ করা জমির তুলনায় সাধারণত জঙ্গলের জমিতে ছত্রাক অপেক্ষা জীবাণুর সংখ্যা বেশি। আনুপাতিক হিসাবটা যেমন ফসলে ০.৩:০.৮ থেকে ০.৮:১ ফল বাগানে ১০:১ আর জঙ্গলে তা ৫০:১ থেকে ১০০০:১।

সূত্র: (Teeming with Microbes, Jeft Lowenfels and Wayne Lewis,September 2010.Timber press)

কালো মাটি

৫.২.ক. মাটি শোধন ও প্রোবায়োটিকস তৈরিঃ

একটা কথা সত্য অকর্ষিত জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ প্রাথমিক পর্যায়ে ফসল ফলাতে ম্যাজিকের মত কাজ করে। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় দিন যত গড়ায় তত রাসায়নিক সারের পরিমাণ বাড়াতে হয় এবং রাসায়নিক সার বাড়ানোর তুলনায় ফলন কমতে থাকে। ক্রমাগতহারে মাটিতে রাসায়নিক সার, কৃষিবিষ, আগাছানাশক প্রয়োগের ফলে মাটিতে বসবাসরত বিভিন্ন উপকারি প্রাণি যেমন কেঁচো ও অনুজীবের কার্যকারিতা হ্রাস পায় এবং মাটির জন্য প্রয়োজনীয় উপকারি প্রাণি ধ্বংস হয়ে যায়। যার ফলে উদ্ভিদ খাদ্যের পুনরাবর্তন ঠিকমত হয় না, মাটি ক্রমশঃ অনুর্বর হতে শুরু করে। এর ফলে মাটির ডিনাইট্রিফিকেশন গ্যাস হিসেবে নাইট্রোজেন ক্ষয় বেশি হয় ও মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ কমতে শুরু করে এবং মাটি মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। এতে করে ভূমিক্ষয় ও উদ্ভিদ খাদ্যের অপচয় বাড়ে। সাথে সাথে মাটির মৌল গঠন ভেঙ্গে পড়ে এবং বালির আনুপাতিক অংশের পরিমাণ বাড়ে। এক সময় দোঁআশ মাটি বেলে মাটিতে পরিনত হয়। তাই মাটির গঠন ধরে রাখতে মাটিকে শোধন করে প্রয়োজনমতো জৈব খাবার দিতে হবে।

সূত্রঃ Organic Farming:heory & Practice, Scientific publication, Jhodpur, Palaniyappan, S P and K Annadural 1999

গোবরে পোকা, কেঁচো

মাটি শোধনঃ

৭০-এর দশক হতে জমিতে প্রতিনিয়ত রাসায়নিক ব্যবহার করার ফলে মাটির উপকারী জীবাণুগুলি ধ্বংসের শেষ প্রান্তে রয়েছে। আবার কোথাও কোথাও মাটি শোধন করার নামে জমিতে আগুন ও ব্লিচিং দেয়া হয়। কিন্তু জমিতে কখনই আগুন ও ব্লিচিং দেয়া যাবে না, তাতে করে অনেক উপকারী জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া এবং পোকা-মাকড় ধ্বংস হয়ে যায়। তাই দূষিত ও মৃত্যু প্রায় মাটিকে জাগ্রত করার জন্য মাটি শোধন করা জরুরী।

আজকাল অনেক পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে মাটি শোধন করা হয়। কিন্তু আমরা জৈবিকভাবে মাটি শোধনের জন্য ভারতের পদ্মশ্রী প্রাপ্ত প্রাকৃতিক কৃষি গবেষক শ্রী সুভাষ

পালেকারের উদ্ভাবিত তরল প্রোবায়োটিকস দ্রবণ (জীবামৃত বা জীবন বন্ধু) এবং পঞ্চগব্য ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে মাটি শোধন করার কাজটি গুরুত্বের সাথে করবো। তাছাড়া সোলারাইজেশন, ডলোমাইট ব্যবহার, ধৈঞ্চা আবাদ, ডাল জাতীয় শস্য,সয়াবিন এবং শনপাট আবাদ করে দূষিত মাটিকে শোধন করা যায় এবং মাটির উর্বরতা বাড়ানো যায়।

প্রোবায়োটিক (জীবামৃত/জীবন বন্ধু) তৈরিঃ

উপকরণঃ

ক. ২২০ লিটারের একটা খালি ড্রাম
খ. ১৬০-১৭০ লিটার পরিস্কার পানি
গ. দেশী গাভীর গোবর ১০ কেজি
ঘ. দশ দিনের পুরানো দেশী গাভীর গো-চনা ১০ লিটার
ঙ. ১-২ কেজি চিটা গুড়
চ. যে কোন দেশী ডালের ১-২ কেজি বেসন
ছ. ৬ ইঞ্চি গভীর হতে ভার্জিন মাটি ১ মুঠো (বড় গাছের নীচের গোড়ার মাটি/বাঁশঝাড়ের মাটি)।

প্রোবায়োটিকস তৈরির উপকরণসমূহ

ফর্মুলাঃ
ড. সুভাষ পালেকার

তরল জীবামৃত হলো ভারতের পদ্মশ্রী প্রাপ্ত বিখ্যাত প্রাকৃতিক গবেষক শ্রী সুভাষ পালেকার উদ্ভাবিত সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে তৈরি প্রোবায়োটিকস। যা দিয়ে মাটি শোধন ছাড়াও মাটির উর্বরতা বাড়ানো যায়। নিম্নে এই প্রোবায়োটিকস তৈরির ধাপসমূহ বর্ণনা করা হলো-

প্রথমে ২০০-২২০ লিটার খালি ড্রামে দেশী গাভীর ১০ কেজি কাঁচা গোবর দিন, তারপর দেশী গাভীর ১০লিটার গো-চনা দিয়ে তাতে ১০০ লিটার পানি যোগ করুন। দ্রবণটিতে ক্রমান্বয়ে ১-২ কেজি চিটাগুড়, ১ মুঠো ভার্জিন মাটি এবং ১-২ কেজি বেসন দিয়ে

ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। অতঃপর ড্রামের ৫-৬ ইঞ্চি জায়গা খালি রেখে প্রয়োজনীয় পানি দিয়ে দ্রবণটি ১টি বড় কাঠি বা লাঠির সাহায্যে ঘড়ির কাঁটার ন্যায় হাতের ডানদিকে ৩-৪ মিনিট ঘুড়িয়ে নাড়তে হবে। দ্রবণটি ভালোভাবে মিশিয়ে গেলে ড্রামের মুখ চট দিয়ে ঢেঁকে ছায়াযুক্ত স্থানে বা বড় গাছের নীচে রাখুন। প্রতিদিন নিয়ম করে ৩ বার নির্দিষ্ট একটা সময়ে দ্রবণটি একইভাবে নাড়তে হবে। এই দ্রবণটি ৭২ ঘন্টা পর ব্যবহার উপযোগি হয়। জমিতে ব্যবহার করার সময় দ্রবণের সাথে ১০ গুন পানি মিশিয়ে স্প্রেয়ার মেশিন দিয়ে মাটি ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। ১ বিঘা (৩৩ শতক) মাটি শোধনের জন্য কমপক্ষে ৬০০ লিটার তৈরি প্রোবায়োটিকস ব্যবহার করা সর্বাপেক্ষা উত্তম। ১ম দফা দেয়ার ৭দিন পর একবার এবং তারও ৭ দিন পর আরেকবার অর্থাৎ ৩ সপ্তাহে তিন বার ব্যবহার করতে হবে। এভাবে ব্যবহার করার ফলে মাটি শোধিত হবে এবং মাটিতে প্রচুর প্রোবায়োটিকস সক্রিয় হয়ে হিউমাস তৈরিতে সহায়তা করবে।

প্রোবায়োটিকস তৈরির ছবি (রয়েল অর্গানিক খামার)

৫.২.খ. প্রাকৃতিক প্রোবায়োটিকস প্রয়োগ পদ্ধতি:

মাটি শোধন ও বীজ বপন থেকে শুরু করে ফসল উঠানো পর্যন্ত প্রয়োগ পদ্ধতি -

১ বিঘা (৩৩ শতাংশ) জমিতে ব্যবহারের মাত্রা নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

১ম ধাপ: জমি তৈরির সময় বা বীজ বপনের পূর্ব পর্যন্ত ৩ সপ্তাহে ৩ বারে ৬০০ (৩ x ২০০) লিটার দ্রবণ প্রয়োগ:

২য় ধাপ: বীজ বপন বা চারা রোপনের ১৫-২০ দিন পর ৫ লিটার প্রোবায়োটিকস ৫০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে চারা গাছে ভালোভাবে স্প্রে;

৩য় ধাপ: বীজ বা চারা রোপনের ৩০-৩৫ দিন পর ৫ লিটার প্রোবায়োটিকস ৫০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে গাছে ভালোভাবে স্প্রে;

৪র্থ ধাপ: বীজ বা চারা রোপনের ৪৫-৬০ দিন পর ১০ লিটার প্রোবায়োটিকস ১০০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে গাছে ভালোভাবে স্প্রে;

৫ম ধাপ: বীজ বা চারা রোপনের ৬০-৯০ দিন পর ১৫ লিটার প্রোবায়োটিকস ১৫০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে গাছে ভালোভাবে স্প্রে;

ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক বা বর্ষজীবি ফসল হলে ফসল তোলার আগের ২০দিন পর্যন্ত ২০-২৫ লিটার প্রোবায়োটিক দ্রবণ ২০০-২৫০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে সমস্ত ফসলে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।

৫.২.গ. পঞ্চগব্য তৈরি ও উপকরণ:

এই পঞ্চগব্য উপকরণটি দিয়েও মাটি শোধন করা যায়।

উপকরণ

ক. ৫০ লিটার পানি
খ. ৫ কেজি দেশী গাভীর গোবর
গ. ৫ লিটার দেশী গাভীর গো-মূত্র
ঘ. ৩ লিটার পঁচানো ঘোল/টক দই
ঙ. নিম পাতা ২ কেজি
চ. আতা পাতা ২ কেজি
ছ. বেসন ১ কেজি এবং
জ. ৫০০-১০০০ গ্রাম চিটা গুড়

তৈরির পদ্ধতি: উপরোক্ত উপকরণগুলি একটি মাটির মঠকায় অথবা প্লাষ্টিকের ড্রামে একত্রে মিশিয়ে ২১ দিন পঁচিয়ে নিতে হবে। অতঃপর ১০ গুণ পানি মিশিয়ে নেট বা সুতি কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে মাটিতে স্প্রে করলে প্রচুর প্রোবায়োটিকস উৎপন্ন হয় এবং মাটি শোধন হয়। ১বিঘা (৩৩ শতাংশ) জমির জন্য পঞ্চগব্য কমপক্ষে ৩ বার ব্যবহার করতে হবে।

৫.৩.ক মাটিতে হিউমাস তৈরি:

মৃত গাছপালা ও প্রাণির দেহাবশেষ পঁচনক্রিয়ার মাধ্যমে মাটিতে মিশে কালচে বর্ণের যে জৈব পদার্থ উৎপন্ন করে তাকে হিউমাস বলে। বর্তমানে বাংলার মাটিতে এর উপস্থিতি নেই বললেই চলে, কিছুটা দেখা যায় বন-বাদার এবং পাহাড়ে তাও আবার যথেষ্ট পরিমাণে

নেই। কারণ কলো নরম মাটি কোথাও তেমনটি দেখা যায় না। বিভিন্ন জড় পদার্থ পঁচতে পঁচতে যখন কম্পোস্ট থেকে হিউমাসে রূপান্তরিত হয় তখন এর মধ্যে দু'ধরণের উপাদান তৈরি হয়-এক হিউমিক এসিড দুই ফলাভিক এসিড। এছাড়া হিউমাস গঠনের মধ্যে থাকে ১০ ভাগ জৈব কার্বন এবং ১ ভাগ নাইট্রোজেন (১০:১), সামান্য কিছু অক্সিজেন ও তুলনামূলক কম পরিমাণে সালফার, ফসফরাস এবং অন্যান্য মৌল থাকে। এই হিউমাসই চাষাবাদের জন্য আদর্শ এবং জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে এই হিউমাসের গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা জানি যে-উর্বর মাটি হলো সেই মাটি যাতে উদ্ভিদের পরিপূর্ণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সকল খাদ্যোপাদান সঠিক মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। মাটির অত্যাবশকীয় সকল পুষ্টি উপাদান বজায় রেখে গাছের খাদ্যভান্ডার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে হিউমাস। তাছাড়া মাটির পানি ধারণক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। যেমন- বেলে ও দো-আঁশ মাটিতে পানির অপচয় হ্রাস করে এবং এঁটেল মাটিকে ঝুরঝুরা করে। এছাড়াও মাটির আদ্রতা বজায় রাখে যেমন-গরমকালে মাটির তাপমাত্রা কমাতে এবং শীতকালে মাটিকে গরম রাখতে সাহায্য করে। কোন কারণে মাটির বিষক্রিয়া সৃষ্টি হলে হিউমাস সেই বিষক্রিয়া কমিয়ে দেয়। অর্থাৎ মাটিতে পর্যাপ্ত হিউমাস তৈরি করতে পারলে উদ্ভিদের জন্য বাইরে থেকে কোন প্রকার সারের প্রয়োজন হবে না। তাই উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক অবস্থা তৈরি করতে হলে মাটির মধ্যে তিন ধরণের অবস্থা তৈরি করতে হবে।

ক. মাটিতে পর্যাপ্ত হিউমাস তৈরি করতে হবে অথবা বাইরে থেকে এর যোগান নিশ্চিত করতে হবে;

খ. মাটির উপরিস্থল আচ্ছাদন বা মালচিং দিয়ে ঢেঁকে দিতে হবে যাতে করে সরাসরি বায়ু, বৃষ্টির পানি ও সূর্য্যের আলো দ্বারা টপসয়েল ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

গ. দেশী গরুর গোবর ও গো-মূত্র দিয়ে প্রোবায়োটিকস প্রয়োগের মাধ্যমে মাটিতে প্রচুর পরিমাণে উপকারী জীব-অনুজীব সৃষ্টি করতে হবে যাতে করে ভূমিতে দেশীয় কেঁচোর পূর্ণ আবাসস্থল তৈরি হয়।

নোট: মাটিতে হিউমাস বাড়ানোর জন্য বসতবাড়ির আর্বজনা, খামার জাত বর্জ্য, খৈল, সবুজ সার, পশু-পাখির দেহাবশেষ ও রক্ত, চুলার ছাই, খড়-নাড়া, কচুরীপানা, কাঠালের মুচি, শিমুল ফুল ও গাছপালার লতাপাতা ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া দুইভাগ ডাল জাতীয় শস্যের উচ্ছিষ্ট এবং একভাগ ধান-গমের খড় একসাথে মিশিয়ে মালচিং করলে এগুলি পঁচে প্রচুর হিউমাস তৈরি হবে।

৫.৩.খ. মাটি উন্নতকরণ ও মাটিতে জৈব পদার্থ বাড়ানোর উপায়:

আমরা জানি মাটি মৃত্যু কোন বস্তু নয়, মাটি হলো বহুজীবের আবাসস্থল। যেখানে কেঁচো, বিভিন্ন প্রকার জীবাণু, ছত্রাক, মাইকোরাইজা, মাকড়, কৃমি বা নেমাটোড, গুবরে পোকাসহ বহু রকমের পোকার ডিম পাড়ার জায়গা, পাখির বাসার করার জায়গা ইত্যাদি। মাটিতে বসবাসকারী ঐসব জীবাণু, ছত্রাক ও কেঁচো মৃত্তিকা বাস্তুতন্ত্রের (Eco System)

অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখানে প্রত্যেকেই পারস্পরিক খাদ্যশৃঙ্খলে আবদ্ধ। বিভিন্ন অণুজীবের সম্মিলিত কার্যকারিতা সাপেক্ষে মাটি ও উপযুক্ত আবহাওয়ায় উদ্ভিদ গড়ে উঠে। উদ্ভিদ ও প্রাণির দেহাবশেষ মাটির জৈব পদার্থে পরিণত হয়। চক্রাকারে এই পদ্ধতি অনন্তকাল ধরে চলছে এবং চলবে। স্বাভাবিকভাবে উদ্ভিদের বাড়-বাড়ন্ত হচ্ছে এবং প্রাকৃতিক নিয়মে জীবনচক্র সম্পূর্ণ হচ্ছে। কোটি কোটি বছর পরেও প্রকৃতি এখনও নিঃস্ব হয়ে যায়নি। এখানে প্রকৃতির বিশালত্বের জন্য মানুষকেও কিছুই করতে হয়নি বরং প্রকৃতি থেকে অনেক বেশি আহরণ ও আদায় করতে গিয়ে মাটির স্বাভাবিক অবস্থাকে আমরা ধ্বংস করে চলেছি।

মাটির জীববৈচিত্র্য *ছবির উৎস* Soil Vasu

মাটিতে সকল ধরণের অণুজীব ও প্রাণি প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। যাদের নিজেদের বংশ বৃদ্ধি ও মৃত্যু-এই চক্র আবর্তিত হওয়ার ফলে মাটির জৈব বস্তু আবদ্ধ হওয়া খনিজ পদার্থকে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় নিয়ে আসে। ফলে মাটির সজীবতা বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদিকা শক্তি গতিশীল হয়। উদ্ভিদের বৃদ্ধি উপযোগি হরমোন, উৎসেচক ইত্যাদির পরিমাণ বাড়ে, মাটি হালকা হয়, বায়ু চলাচলে সুবিধা হয়, জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব স্থিতাবস্থায় আসে। মাটিতে সর্বোপরি হিউমাসের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে মাটির জৈববৈচিত্র্য রক্ষা পায়।

রাসায়নিক সার ও বিষ প্রয়োগে মাটিতে কি পরিমাণ কেঁচো ও উপকারি জীবাণু হ্রাস পাচ্ছে এবং কত সংখ্যক নির্দিষ্ট সময় পরে মারা যাচ্ছে তার কোন সঠিক তথ্য আমাদের কাছে নেই। তবে একথা সত্য কৃষিতে রাসায়নিকের প্রভাবে মাটির অণুজীবের বিশেষ উপকারি অণুজীবের কার্যকারিতা যেহ্রাস পেয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। সেজন্যই আজকের দিনে মাটিতে বাইরে থেকে তার প্রয়োজনীয় উপাদান প্রয়োগের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় উদ্ভিদ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ভয়ংকর বিষ ব্যবহার করেও রোগের প্রকোপ কমেনা এমনকি শত্রু ছত্রাক মারা পড়ে না।

মাটিতে রাসায়নিক সার ও রাসায়নিক বিষ এবং আগাছানাশক প্রয়োগ করা বন্ধ হলে মাটির জন্য উপকারি জীবাণু, বন্ধু ছত্রাক ট্রাইকোডারমা ভিরিডি, ট্রাইকোহার্জেনিয়াম, গ্লাইয়োক্ল্যাডিয়াম, অ্যাসপারাজিলাস নাইজার, সিউডোমোনাস ফ্লুরেসেন্স এবং কেঁচো ইত্যাদির সংখ্যা কাঙ্খিতমাত্রায় বৃদ্ধি পাবে। ফলে মাটির বাস্তুতন্ত্রের (Eco System) জৈবিক সত্ত্বা ফিরে এলে বাইরে থেকে চাপান জীবাণুর প্রয়োগ নিয়মিত না করলেও চলবে। তাই সকলে মিলে মাটির প্রাণ ফিরিয়ে আনতে হবে এবং সভ্যতার ধারক-বাহক এই মাটিকে রক্ষা করা একটা পবিত্র দায়িত্ব।

মাটির প্রাণ ফিরিয়ে আনতে হলে আমাদেরকে মাটি পরীক্ষার পর রিপোর্ট অনুযায়ী বিভিন্ন ঘাটতি পুরুণের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়াতে হবে। সেজন্য জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ বিভিন্নবস্তু প্রয়োজন মত প্রয়োগ করার জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া সম্ভব।

১. মাটিতে প্রচুর পরিমাণে দেশী গরুর গোবর, পঁচানো কচুরীপানা, সরিষার খৈল, নীমের খৈল,বাদামের খৈল, হাঁড়ের গুড়া ও গৃহস্থালির পঁচানো আর্বজনা ব্যবহার করলে জমিতে বহুগুন জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়;

গোবর ও অন্যান্য উপাদান প্রয়োগের পদ্ধতি ও পরিমাণ:

(ক) একটি জমিতে বছরে একাধিক ফসল করলে প্রতি বিঘা জমিতে ২বার ২টন কচুরীপানা এবং ৩ টন দেশী গরুর গোবর একসাথে ৪৫ দিন পঁচিয়ে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। জমির উর্বরতা বাড়াতে শংকর জাতের গরুর গোবর ব্যবহার না করাই শ্রেয়। কিন্ত উপায় না থাকলে বিঘা প্রতি শংকর জাতের গরুর গোবর ৬ টন এবং ৩ টন কচুরীপানা একসাথে কমপক্ষে ৯০ দিন পঁচাতে হবে। তারপর সেটা জমিতে প্রয়োগ করতে হবে;

(খ) বিভিন্ন শস্যাদির খৈল কমপক্ষে ১৪-২১ দিন পঁচিয়ে বিঘা প্রতি ৩০-৫০ কেজি প্রয়োগ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

(গ) হাঁড়ের গুড়া প্রতিবিঘা জমিতে ৩০-৫০ কেজি বছরে একবার ব্যবহার করা প্রয়োজন;

(ঘ) গৃহস্থালির আর্বজনা যত পরিমাণ দেয়া যায় তাতে ক্ষতি নেই;

২. বিভিন্ন ধরণের কম্পোস্ট যেমন কুইক কম্পোস্ট, ভার্মি কম্পোস্ট, গর্ত কম্পোস্ট, খাঁচা কম্পোস্ট, ট্রাইকো কম্পোস্ট ইত্যাদি ব্যবহার করে মাটির জৈব পদার্থ বাড়ানো যায়; এই সব কম্পোস্ট ভিত্তি প্রয়োগে প্রতি শতাংশে ৮-১০ কেজি এবং পরবর্তীতে উপরি প্রয়োগ করলে প্রতি শতাংশে ৩ কেজি হারে ব্যবহার করতে হয়।

নোট: কুইক কম্পোস্ট ও ট্রাইকো কম্পোস্ট ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা আছে। কারন এগুলো প্রয়োগের পরিমাণ বেশি হলে গাছের ক্ষতি হয়।

৩. জমিতে সীম, মাষকলাই, মুগ, মসুর, ছোলা, মটর, চীনাবাদাম, সয়াবিন (নন জিএমও),পাট, অড়হড়, ধৈইঞ্চ্যা ইত্যাদি চাষ করলে ফসল পাওয়ার পাশাপাশি মাটিতে প্রচুর জৈব পদার্থ যোগ হয়;

৪. গ্লাইরিসিডিয়া, তুঁত, শনপাট, নীল প্রভৃতি চাষ করলে প্রচুর নাইট্রোজেন ও জৈব পদার্থ পাওয়া যায়;

৫. ফসল তোলা বা কাঁটার সময় গোড়া সমেত না উঠিয়ে ফসলের কান্ডসমেত কিছু অংশ বাদ দিয়ে ফসল কাঁটলে মাটিতে পঁচে সেগুলো জৈব পদার্থে পরিনত হয়;

৬. ধৈইঞ্চ্যা, শনপাট এবং ফার্ন ইত্যাদি জন্মিয়ে সেগুলি ৪৫-৬০ দিন বয়সে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ সবুজ সার হিসেবে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়; সীম বা লিগুম জাতীয় শস্য চাষ করলে প্রতি একরে ৩০-৬০ কেজি নাইট্রজেন যোগ হয়।

৭. ফসলের উচ্ছিষ্ট পাতা, কান্ড ইত্যাদি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়;

৮. নীলাভ ও সবুজ শ্যাওলা, অ্যাজোলা প্রভৃতি জন্মিয়েও জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়;

৯. তরল বা জীবাণু সার ব্যবহার করেও জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়;

১০. ক্ষেত নিড়ানী দেয়ার পর অ-কৃষি উদ্ভিদ ও উদ্বৃত্ত সঙ্গী শস্য ইত্যাদি এক জায়গায় পঁচিয়ে জমিতে ব্যবহার করলেও জৈব পদার্থের পরিমাণ অধিক হারে বৃদ্ধি পায়।

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি ছাড়াও আরও নানা উপায়ে মাটিতে নাইট্রোজেন যোগ হয় যেমন- বজ্রপাতের কারনে প্রাকৃতিক উপায়ে বছরে ১০ মিলিয়ন টন নাইট্রোজেন মাটিতে আবদ্ধ হয় এবং জৈব উপায়ে নাইট্রোজেন বন্ধনের পরিমাণ ১৭৫ মিঃ টন। তাছাড়া মৌসুমী বৃষ্টি পাতের ফলে মাটিতে নাইট্রোজেন সংযোজিত হয়। যা একর প্রতি ১০ কেজির কাছাকাছি হয়।

ধানের জমিতে ও জলজ জায়গায় জন্মানো নীলাভ সবুজ শ্যাওলা এক ধরনের ফার্ন এবং অ্যাজোলা জমিতে নাইট্রোজেন সংযোগ করতে পারে, যা আবার গড়ে এককভাবে ৮-১০কেজি নাইট্রোজেন যুক্ত করতে পারে। এই সব অ্যাজোলা আবার নেমাটোড নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।

সারণী নং-২, উপমহাদেশীয় ফসলে নাইট্রোজেন আবদ্ধকারি ফসল ও পরিমাণ

ফসল	নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণ (কেজি/বিঘা)	পরবর্তী দানাশস্যে নাইট্রোজেন পাওয়ার হিসেব (কেজি/বিঘা)
সয়াবিন (নন জিএমও)	৬.৫৫-১৭.৪০	৩-৭
ছোলা	৩.৫-৮.৪৩	৮.১০
বরবটি	৭-১১.৩৭	৯
মুগ	৭-৭.৭	৪
বাদাম	১৫-২২	৪
মসুর	৪.৬৮-১৩.৩৮	৪
মটর	৬.১৫	৪-৫
অড়হড়	৯.১০-২৬.৭৭	৩-৭

সূত্র: জৈব সার ও কৃষি বিজ্ঞানে জীবাণুর অবদান, শ্যামল বণিক, ১৯৮৫, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ১২৮

৫.৩.গ. সীম গোত্রীয় শস্য আবাদ ও সবুজ সার তৈরি:

মাটিতে লিগুম বা সীম জাতীয় শস্য যেমন-বিভিন্ন প্রকার সীম, বিভিন্ন প্রকার ডাল-ছোলা, খেসারী, মুগ, মাষ কলাই, মটর, কুলথি, অড়হড় ইত্যাদি আবাদ করা ও ধৈইঞ্চা, শনপাট ইত্যাদি মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে সবুজ সার তৈরি করার মাধ্যমে এবং ধান ক্ষেতে অ্যাজোলা বা ছুটি পানা ছেড়ে দিয়েও মাটির জৈব পদার্থ বৃদ্ধি করা যায়।

ধৈইঞ্চা

শনপাট

৫.৩.ঘ বিভিন্ন জৈব সার তৈরি ও মাটিতে প্রয়োগ:

ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং-এ বাইরের ইনপুট দিতে হয় না, কিন্তু আমাদের মাটিতে যে পরিমাণ জৈব পদার্থ থাকার কথা সে পরিমাণ জৈব পদার্থ এখন আর নেই তাই বাধ্য হয়ে মাটির জৈব ঘাটতি মেটাতে অন্যান্য যোগান সরবরাহের পাশাপাশি সুষমমাত্রায় জৈব সার প্রয়োগ করা জরুরী। নিম্নে কিছু জৈব সার (কম্পোস্ট) তৈরির পদ্ধতি ও প্রয়োগ মাত্রা উল্লেখ করা হলো।

জৈব সার তৈরির উপকরণ:

ক. গোবর
খ. চিটাগুড়
গ. গৃহপালিত পাখির বিষ্ঠা (হাঁস-মুরগীর)
ঘ. বিভিন্ন প্রকার খৈল
ঙ. ধানের কুড়া বা কাঁঠের গুড়া (কাঠের গুড়া ইউক্যালিপটাস ও এ্যাকাশিয়া ব্যতীত)
চ. কচুরিপানা
ছ. সবুজ লতাপাতা/ ফসলের অবশিষ্টাংশ
জ. ডিমের খোসা
ঝ. ব্যবহৃত চা পাতি
ঞ. বিভিন্ন পশু-পাখির রক্ত
ট. বাড়ির উচ্ছিষ্ট
ঠ. মাছ ধোয়া পানি
ড. কোঁদাল/বেলচা
ঢ. চট
ণ. পানি
ত. বায়োডার্মা পাউডার / লিকুইড ইত্যাদি।

১. সাধারণ কম্পোস্ট: এই কম্পোস্ট দুই ভাবে করা যায়। (ক) গর্ত পদ্ধতি ও (খ) স্তূপ পদ্ধতি।

(ক) গর্ত পদ্ধতি: কম বৃষ্টিপাত এলাকায় বা শুষ্ক মৌসুমে গর্ত পদ্ধতিতে কম্পোস্ট করা উচিত। এজন্য নিম্নোক্ত ধাপে এই কম্পোস্ট তৈরি করা যায়-

- ৪ ফুট প্রস্থ, ৩ ফুট গভীর ও প্রয়োজন অনুযায়ী দৈর্ঘ্যের একটি গর্ত তৈরি করতে হবে;
- কম্পোস্ট তৈরির উপকরণ হিসেবে ৪ ভাগ ভেজা কচুরিপানা বা অন্যান্য লতাপাতা: ৩ ভাগ শুকনো খড়-আর্বজনা: ২.৫ ভাগ গোবর এবং ০.৫ ভাগ মাটি।
- কম্পোষ্টের জন্য স্তর সাজানোর আগে গর্তের তলায় কিছু খড়, কাকড় ও মোটা বালি মিশিয়ে পিটিয়ে দিতে হবে। শোষণকারী স্তর হিসাবে কিছু খড় বিছিয়ে

দেয়াই ভালো। গর্তের চারপাশে সামান্য উঁচু করে আইল দিতে হবে এবং গর্তের ভিতরে ও আইলে গোবর গোলা কাদামাটি লেপে দিতে হবে;

- প্রথমে আধা পঁচা কচুরিপানা, ফসলের অবশিষ্টাংশ, সবজির খোসা, আগাছা, আবর্জনা, খড়কুটো ফেলে ১৫ সেঃ মিঃ বা ৬ ইঞ্চি পুরু করে স্তর সাজাতে হবে। তার উপর গোবর দিতে হবে এবং এভাবে ৩-৫টা স্তর সাজিয়ে নিতে হবে। তবে কম্পোস্ট তৈরির ক্ষেত্রে কোন কিছুই তাজা তৈরি করা উচিত নয়। কারন তাতে পটাশ ও নাইট্রোজেন এর উপাদান নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং স্তর সাজানোর আগে কচুরিপানা ও অন্যান্য সবুজ/তাজা অংশগুলো ৮-১০ দিন রেখে আধা পঁচা করে নিতে হবে। সম্ভব হলে প্রতিটি স্তরে কিছু তৈরি কম্পোস্ট অল্প পরিমানে ছিটিয়ে দিতে হবে। এতে করে তৈরি কম্পোস্ট এর ব্যাকটেরিয়া দ্রুত কম্পোস্ট তৈরিতে সহায়তা করবে;
- মাটির উপরে ২.৫ ফুট পরিমাণ উঁচু করার পর সব উপরে গোবর গোলার মাটি / কাদার প্রলেপ দিতে হবে।
- প্রলেপ দেয়া স্তুপ আস্তে আস্তে নীচু হয়ে যাবে অতঃপর ৩০ দিন পর-পর কোদাল দিয়ে ২বার ২টা উল্টানি দিতে হবে। তারপর ১৫ দিন পর-পর আবার ২ বার উল্টানি দিলে ৯০ দিনে কম্পোস্ট ব্যবহার উপযোগি হবে।

(খ) স্তূপ পদ্ধতি: স্তূপ পদ্ধতির কম্পোস্ট করতে হবে এমন জায়গায় যেখানে পানি জমে থাকবে না। জায়গাটি হবে ছায়া যুক্ত। স্তূপ কম্পোস্ট মাটির উপরে গর্ত পদ্ধতির মতো স্তর সাজিয়ে করতে হবে। স্তর একদিনেই করা যায় অথবা ৪/৫দিন ধরে তৈরি করা যায়।

- এ পদ্ধতিতে প্রথমে ৩ মিটার বা প্রায় ১০ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ১.২৫ মিটার বা প্রায় ৪ ফুট প্রস্থ এবং ১.২৫ মিটার বা ৪ ফুট উঁচু গাদা তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে গাদা ছোট / বড় করা যাবে। এজন্য সম মাপের ৪টি বাঁশের বেড়া বা টিন দিয়ে খাঁচা তৈরি করে নিতে হবে;
- গর্ত পদ্ধতির মত করে স্তর সাজাতে হবে;
- কচুরিপানা বা অন্যান্য অংশগুলো (লম্বা হলে) ১৫ সেঃ মিঃ ৬ ইঞ্চি মাপে টুকরো টুকরো করে কেটে স্তর সাজাতে হবে;
- উক্ত স্তরের উপর গবাদি পশুর মূত্র ও গোবর পানিতে গুলিয়ে স্তরের উপরিভাগে ছিটিয়ে দিতে হবে। ২.৫ সেঃ মিঃ বা ৫ সেঃ মিঃ বা ১ ইঞ্চি থেকে ২ ইঞ্চি পুরু করে কাঁচা গোবর ও কাদা মিশ্রণ করে প্রলেপ দিতে হবে।

কম্পোস্ট গাদা তৈরির প্রক্রিয়া:

ক) কম্পোস্ট গাদা তৈরির কাজ শেষ করার প্রায় দুই সপ্তাহ পর কম্পোস্ট উল্টায়ে দিতে হবে বা দ্বিতীয় চেম্বারে স্থানান্তর করতে হবে। খেয়াল করতে হবে কম পঁচা আবর্জনা গুলো গাদার মাঝখানে রাখতে হবে। দ্বিতীয় চেম্বার হতে ১৫ দিন পর তৃতীয় চেম্বারে স্থানান্তর

করতে হবে। তৃতীয় চেম্বারে ৩০ দিন রাখতে হবে। চতুর্থ চেম্বারে ৩০ দিন রাখার পর কম্পোস্ট ব্যবহার উপযোগী হবে। স্তূপ পদ্ধতিতে একই ভাবে নাড়া চাড়া করে কম্পোস্ট তৈরি করতে হবে।

খ) গো-চনা ও গোবর এগুলো সঠিক পরিমাণে ব্যবহার করা হলে কম্পোস্ট ৯০ দিনের মধ্যে ব্যবহার করার উপযোগি হয়।

কম্পোস্ট পরীক্ষা:

কম্পোস্ট এর পঁচনক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার লক্ষণসমূহ নিম্নরূপ

ক) কম্পোস্ট স্তূপে ব্যবহৃত উপাদানের পূর্বের গন্ধ থাকবেনা।

খ) দুর্গন্ধমুক্ত হবে।

গ) কম্পোস্ট এর গঠন হবে হালকা স্পঞ্জের মত।

কম্পোস্ট সংরক্ষণ:

অতিরিক্ত রোদে ও বৃষ্টিপাতে কম্পোস্ট এর গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায়। তাই এই সার সংরক্ষনের সময় বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করা দরকার। কম্পোস্ট সাধারণত কোন চটের/প্লাস্টিকের বস্তায় সংরক্ষণ করা যায়। এচাড়াও গাছের নীচে আথবা উঁচু কোন জায়গায় পরিমাণ মত গর্ত করে তাতে মিশ্র সার রেখে তার উপর প্লাষ্টিক অথবা কলাপাতা/তালপাতা দিয়ে ঢেকে সংরক্ষণ করা উচিত।

প্রয়োগ মাত্রা: জমির উর্বরতা ও ফসলভেদে প্রতি একরে ৪-৬ টন বা ৪০০০-৬০০০ কেজি কম্পোস্ট সার ব্যবহার করতে হয়।

কুইক কম্পোস্ট তৈরি পদ্ধতি

কুইক কম্পোস্ট: খুব স্বল্প সময়ে যে পদ্ধতিতে কম্পোস্ট করা যায় তাকে কুইক কম্পোস্ট বলে।

সারণি নং ৩, উপকরণসমূহ (৩৫০ কেজির জন্য)

ক্র.নং	উপকরণ	পরিমাণ	রেশিও
ক	বাদাম বা সরিষা খৈল	৫০ কেজি	রেশিও: ১:২:৪
খ	কাঠের গুড়া / ধানের কুঁড়া	১০০ কেজি	
গ	আধা পঁচা গোবর (দেশী গরুর)	২০০ কেজি	
ঘ	গো-চনা বা গো-মুত্র (দেশী গাভীর)	২০ লিটার	অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ক) খৈল ভালোভাবে গুড়া করে কাঠের গুড়া / চালের কুঁড়া বা উভয় উপাদান ভালোভাবে মেশাতে হবে। তারপর মেশানো উপাদান আধা পঁচা গোবরের সাথে ভালোভাবে মেশাতে হবে। পারলে সিমেন্ট-বালুর মশলা মেশানোর মত করে মেশানো;

খ) মিশ্রণে পরিমাণমত পানি যোগ করে কাঁই বানাতে হবে, যাতে ঐ মিশ্রণ দিয়ে কম্পোস্ট বল তৈরি করলে ভেঙ্গে যাবে না। তবে ৩ ফুট উঁচু থেকে ধীরে ছেড়ে দিলে বলটি হালকা ফেটে বা ভেঙ্গে যাবে কিন্তু ছড়িয়ে যাবে না। যদি ছড়িয়ে যায় তবে আরও পানি মেশাতে হবে এবং অনুরূপভাবে পরীক্ষা করতে হবে;

গ) কুইক কম্পোষ্টের মশলা প্রস্তুত হলে স্তুপটি চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে;

ঘ) স্তুপ তৈরির ২৪ ঘন্টা পর থেকে ভিতরের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং ৪৮–৭২ ঘন্টার মধ্যে ৬০ সেঃ ৭০ সেঃ তাপমাত্রা হতে পারে। এরকম সৃষ্ট তাপে মিশ্রিত পদার্থের গুনাগুন নষ্ট হতে পারে। তাই স্তুপটি ভেঙে ওলট-পালট করে ১ থেকে ১.৫ ঘন্টা সময়ের জন্য মিশ্রণকে ঠান্ডা করে নিতে হবে এবং পুনরায় আগের মত স্তুপ সাজাতে হবে;

ঙ) এভাবে ৭২ ঘন্টা পর পর স্তুপ ভেঙে ওলট-পালট করে দিলে ১৫ দিনের মধ্যে কুইক কম্পোস্ট সার তৈরি হবে; তবে তা ২৮ দিন পরে ব্যবহার করা ভালো;

চ) তৈরিকৃত কুইক কম্পোস্ট চটের বস্তায় ভরে ছায়ায় রেখে ২-৩ মাস সংরক্ষণ করা যাবে;

নোট:

(ক) কুইক কম্পোস্ট তৈরির প্রাথমিক সময়ে দুর্গন্ধ ছড়ায় তাই আশে-পাশের বাসিন্দাদের যাতে অসুবিধা না হয় সেটা চিন্তা করে বানাতে হবে;

(খ) ইহা প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনে পাকা হাউজ বা রিং-স্লাব ব্যবহার করা যাবে। সেক্ষেত্রে স্তুপের উপরে ছায়ার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

প্রয়োগ মাত্রা:

- জমির উর্বরতা ও ফসল ভেদে প্রতি শতাংশ জমিতে প্রায় ৬-১০ কেজি কুইক কম্পোস্ট সার ব্যবহার করতে হয়;
- ধান ও গম ফসলের জমি তৈরির সময় শতাংশ প্রতি ৬-১০ কেজি এবং উপরি প্রয়োগের সময় ২ কেজি হারে ছিটিয়ে দিতে হবে এবং জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে;
- সব ধরনের সবজি ক্ষেতের জমি তৈরির সময় প্রতি শতাংশে ৬-৭ কেজি এবং উপরি প্রয়োগের ক্ষেত্রে শতাংশে ২ কেজি কম্পোস্ট সার গাছের চারিদিকে রিং বা নালা করে ছিটিয়ে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

সতর্কতা: কুইক কম্পোস্ট সার প্রয়োগের পর পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। কুইক কম্পোস্ট বেশি মাত্রায় ব্যবহার করলে সবজি জাতীয় গাছের বাড়-বাড়ন্ত বিঘ্নিত হতে পারে। তাই সতর্কতার সহিত ব্যবহার করতে হয়।

কুইক কম্পোস্ট-এর জন্য মসলা তৈরি

কেঁচো সার বা ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি ও ব্যবহার

একটি প্রান্তিক কৃষক পরিবারের জন্য কেঁচো সার বা ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি:

ক) কেঁচো সার প্রস্তুত করার জন্য ৩টি সিমেন্টের তৈরি রিং সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয় (বাজারে যেগুলি পাওয়া যায়)।

খ) রিং গুলি ছায়াযুক্ত স্থানে এবং জলবদ্ধতা বা বন্যা মুক্ত স্থানে বসাতে হবে;

গ) রিং-এর পাশ দিয়ে পানি রাখার জন্য নালা করতে হবে যাতে করে পিঁপড়া ইঁদুর ও অন্যান্য পোকা-মাকড় নালা ডিঙ্গিয়ে মূল হাউজে যেতে না পারে;

ঘ) এ পদ্ধতিতে বাড়ির সব ধরনের জৈব আর্বজনা,ফসলের উচ্ছিষ্ট, কলাগাছের মোচা ও কলা গাছের টুকরাসহ সকল ধরনের জৈব বর্জ্য কুঁচিকুঁচি করে কেঁটে এবং ক্ষেত্র বিশেষে গুড়া করে তার সাথে সম পরিমাণ গোবর মিশিয়ে সেগুলোকে আংশিকভাবে পঁচার জন্য বা কেঁচোর প্রি-ডাইজেষ্ট-এর জন্য ঢাকনাযুক্ত তৈরি গর্তে অথবা রিং-এ ১৫/২০ দিন রেখে দিতে হবে;

ঙ) ১৫/২০ দিন পরে প্রি-ডাইজেষ্ট খাদ্য গুলো অধিকাংশ নরম হয়ে থাকলে ২/৩ দিন পর কেঁচো সার তৈরির রিং-এ প্রি-ডাইজেষ্ট খাদ্য ১ ভাগ ও পঁচানো গোবর ২ ভাগ পুনঃ মিশ্রণ করে রিং-এ স্থাপন করতে করতে হবে;

চ) তারপর ১০০০- ২০০০ টি এপিজেয়িক জাতের কেঁচো ছাড়তে হবে। ছাড়ার পর স্তুপটি নারিকেল / সুপারি অথবা তালপাতা অথবা পুরোনো চট দিয়ে ঢেঁকে রাখতে হবে;

ছ) হাউজটির উপরে একটি চালার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে বৃষ্টির পানি প্রবেশ না করে;

ছ) উল্লেখিত পরিমাণ কেঁচো ৪৫-৫০ দিনে উক্ত মিশ্রণ থেকে ৩৫%-৩৮% সার উৎপাদন করতে সক্ষম। পর্যায় ক্রমে এ সার সংগ্রহ করে বাঁশের চালুনি দ্বারা চেলে নিয়ে সার ও কেঁচো পৃথক করতে হবে। পুনরায় রিং-এ খাদ্য প্রয়োগ করে কেঁচো গুলো ছেড়ে দিতে হবে। এভাবে সার উৎপাদনের কাজ চলমান রাখতে হবে।

সাবধানতা:

১. রিং এর ভেতরে পিঁপড়া মারার জন্য কীটনাশক, কেরোসিন, ব্লিচিং পাউডার, পেট্রোল, ডিজেল,সাবান, সোডার পানি দেয়া যাবে না;

২. মুরগি ও অন্যান্য পশু-পাখির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য হাউজটি চট / ছালা দিয়ে ঢেঁকে রাখতে হবে;

৩. পেঁপের গাছের ছাল, সাজিনা গাছের ছাল, করলা, রসুনের খোসা ইত্যাদি উপকরণ দেয়া যাবে না।

কেঁচো সার প্রয়োগ মাত্রা :

১. ফসলের মাঠ তৈরিতে একর প্রতি ৪০০০-৬০০০ কেজি এবং উপরি প্রয়োগ হিসেবে প্রতি শতাংশে তিন কেজি;

২. সবজি বীজতলায় প্রতি শতাংশ জমিতে ৮-১০ কেজি;

৩. মাঝারী সাইজের প্রতি ফুলের টবে বা ছোট ফল গাছের টবে ২-৩ কেজি ব্যবহার করা যাবে;

৪. মাঝারি ও বড় গাছের (৫ বছরের উর্ধ্বে) চতুরদিকে রিং করে ৫-১০ কেজি কেঁচো সার ব্যবহার করা যায়;

রিং ও চারিতে কেঁচো কম্পোস্ট তৈরির ছবি

রিং-এ কেঁচো কম্পোস্ট তৈরির ছবি

ট্রাইকো কম্পোস্ট তৈরি পদ্ধতি ও ব্যবহার:

সারণি নং ৪, ট্রাইকো কম্পোস্ট তৈরির উপকরণসমূহ

নং	উপকরণ	পরিমাণ	মন্তব্য
১	দেশী গরুর গোবর	২০০ কেজি	
২	দেশী গাভীর গো-চনা	১০লিটার	
৩	ভুট্টার আটা/যে কোন ডালের বেসন	১০ কেজি	
৪	ধানের শুকনো পঁচা খড়	১০ কেজি	ছোট ছোট টুকরো করতে হবে
৫	কাঠের গুড়া	১১৫ কেজি	
৬	সবুজ ঘাস/লতা-পাতা, কচুরীপানা	১০০ কেজি	কুঁচি কুঁচি করে কেঁটে নিলে ভালো হয়
৭	নিম পাতা (কাঁচা)	৩ কেজি	
৮	সরিষার খৈল/বাদামের খৈল	১০ কেজি	২০ লিটার পানিতে গুলিয়ে নিতে হবে
৯	দেশী হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা	২০ কেজি	
১০	চিটাগুড়	২ কেজি	৫ লিটার পানিতে গুলিয়ে নিতে হবে
১১	ছাই	২০ কেজি	
১২	ট্রাইকোডার্মা/ বায়োডার্মা পাউডার	২৫০ গ্রাম	৪ লিটার পানিতে গুলিয়ে নিতে হবে
	মোট	৫০০.২৫ কেজি	

হাউজ তৈরি: প্রস্থ ৩.৫ ফুট, দৈর্ঘ্য ৭ ফুট এবং ২.৫ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন ৪টি চৌবাচ্চা বিশিষ্ট ১টা হাউজ বানাতে হবে। হাউজটির উপর চালা দিতে হবে। প্রত্যেকটি চৌবাচ্চার পাশে নীচের অংশে একটা ছোট ফুটো করতে হবে, যাতে করে ট্রাইকো কম্পোস্ট-এর তরল তলানী বা লিচিং জমা হয়।

প্রস্তুত প্রণালী

১. উল্লেখিত উপকরণগুলি একসাথে মেশানোর জন্য আলাদা জায়গায় প্রথমে কাঠের গুড়া মেঝে/মাটিতে বিছিয়ে নিতে হবে তারপর গোবর, ভূট্টার আটা, শুকনো পঁচা খড়, সবুজ লতা-পাতা, কচুরীপানা, নিম পাতা, দেশী হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা দিয়ে সমস্ত উপকরণটি উলট-পালট করতে হবে। উপকরণগুলি ভালোভাবে মেশানো হলে তাতে পর্যায়ক্রমে খৈল ভেজানো পানি, চিটাগুড়ের দ্রবণ মিশ্রণটির উপর ছিটিয়ে দিন। তারপর আবার উলট-পালট করুন এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ পরিষ্কার পানি দিয়ে ইটের গাঁথুনিতে ব্যবহৃত সিমেন্টের মশলা তৈরির মতো পর্যায়ে নিয়ে আসুন। এরপর মিশ্রণগুলি আলাদা হাউজে কয়েকটি স্তরে সাঁজিয়ে দিন। প্রত্যেকটি স্তরে ট্রাইকোডার্মা মিশ্রিত দ্রবণটি স্প্রেয়ার মেশিন দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। মিশ্রণটি সাজানো হলে চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে;

২. প্রথমে ১০ দিন পর মিশ্রণটি ভালোভাবে উল্টিয়ে চেম্বার পাল্টিয়ে দিতে হবে। তারপরে ১০ দিন+১৫দিনে আরও ২ বার ভালোভাবে উলট-পালট করে চেম্বার পরিবর্তন করতে হবে। ৪৫-৫০ দিনে ট্রাইকোকম্পোস্ট তৈরি হয়ে যাবে। বস্তায় ভরে ছায়ায় রেখে ৬ মাস পর্যন্ত রাখা যায়;

৩. হাউজের নীচে ছিদ্র অংশ দিয়ে যে তরল তলানি বা লিচিং বের হবে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ট্রাইকো কম্পোস্ট সার ব্যবহার ও প্রয়োগমাত্রা:

- জমি তৈরির সময় প্রতি বিঘা জমিতে (৩৩শতাংশ) ১৬৫ কেজি;
- উপরি প্রয়োগ হিসেবে প্রতি শতাংশে ৩ কেজি (১বার);
- ৫ বছরের উর্ধ্ব বয়সী বড় ফল গাছে ৫-১০ কেজি;
- ৫ বছরের নীচে বয়সী ছোট ফল গাছে ২-৪ কেজি;
- ছোট চারা গাছে ২৫০ গ্রাম।

ট্রাইকো কম্পোস্ট সারের মসলা তৈরি

ট্রাইকো লিকুইড/তরল সার ব্যবহার ও প্রয়োগমাত্রা:

ট্রাইকো কম্পোস্ট হাউজ হতে প্রতি ব্যাচে ৫-১০ লিটার লিকুইড/ তরল পদার্থ পাওয়া যাবে যা গাছের বৃদ্ধির জন্য খুবই উপকারি। এই ট্রাইকো তরল ১ লিটার = ১৫ লিটার পরিস্কার পানির সাথে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে ব্যবহার করা যায়। লিচিং বা তরল সংরক্ষণের জন্য মাটির হাঁড়িতে করে ছায়ায় রেখে ৬ মাস পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

ট্রাইকো কম্পোস্ট সার-এর নির্যাস

৫.৪. জৈব সারের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা:

১. আমরা জেনেছি যে-বাংলাদেশের মাটিতে শতকরা ১ ভাগেরও কম জৈব পদার্থ রয়েছে, যদিও কমপক্ষে ৫-৫.৫ ভাগ জৈব পদার্থ থাকা উচিত। তাই মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য জৈব সার ব্যবহার করা দরকার;

২. জৈব সার ব্যবহারে মাটির উর্বরতা বাড়ে। এতে ফসলের মুখ্য ও গৌণ খাদ্যোপাদান থাকে বলে ফসলের খাদ্য ঘাটতি পুরণ হয়;

৩. মাটির গঠন ও গুনগতমান উন্নত করে এঁটেল ও বেলে মাটি সরস হয় ও পানি ধারন ক্ষমতা বাড়ে। তাছাড়া, এঁটেল ও বেলে মাটিকে কিছুটা দোআঁশ ভাবাপন্ন করে ফসল জন্মানোর অধিক উপযোগি করে তোলে;

৪. জমিতে জৈব সার ব্যবহারের পর আনুমানিক ৬ থেকে ১৮ মাস পর্যন্ত এর প্রভাব থাকতে পারে এবং তা পরবর্তী ফসলেও কাজে লাগে;

৫. জৈব সার ব্যবহারে মাটির উপকারী জীবানুর ক্রিয়াকলাপ বহুগুণে বেড়ে যায় এবং এদের বংশ বিস্তারে সহায়ক হয়;

৬. এ সার মাটিতে রস মজুদ রাখতে সাহায্য করে এবং পানি সহজলভ্য হয়, ফলে সেচের পানির অধিকহারে কাজে লাগে;

৭. এ সার বৃষ্টিপাতজনিত আঘাত ও বায়ুপ্রবাহজনিত ভূমিক্ষয়ের মাত্রা কমিয়ে দেয়;

৮. এই সার গ্রীষ্মকালে মাটিতে তাপমাত্রা কমিয়ে দেয় এবং শীতকালে মাটিকে উষ্ণ রাখতে সহায়তা করে;

৯. জৈব সার ব্যবহারে সব ঋতুতেই গাছের শিকড় ভালোভাবে বৃদ্ধি পায়;

১০. মাটিতে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে সৃষ্ট বিষাক্ততা কমাতে জৈব সার কার্যকরী ভূমিকা রাখে;

১১. জৈব সার ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে পুষ্টি ও গুনগত মান এবং স্বাদ বাড়ায়। ফসল সংরক্ষণ ও গুদামজাত শস্যের সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

তরল সার ও জীবাণু সার:

উপকরণ:

- ইপিলইপিল, কৃষ্ণচূড়া, অড়হর, বগামেডুলা, সীম, ধৈইঞ্চা, কড়ই গাছের কাঁচাপাতার প্রত্যেকের ২ কেজি করে পাতা নিয়ে থেতলে বা ছেঁচে নিতে হবে;
- ৩০ লিটার পানি ধারণ ক্ষমতার বড় একটি মাটির পাত্র ১ টি। মাটির পাত্র নতুন হলে চারপাশে মাটি দ্বারা লেপে নিতে হবে;
- হাঁড়ি বা পাতিলে ২০ লিটার পানিসহ থেতলানো পাতা একত্রে মিশিয়ে নিয়ে হাঁড়ির মুখ এয়ারটাইট করে বেঁধে ফেলতে হবে। তারপর মাটিতে গর্ত করে হাঁড়ি পুঁতে রাখতে হবে। ১৪-২১ দিন পর হাঁড়ি তুলে পানি ছেকে নিতে হবে;

- প্রাপ্ত নির্যাসের সাথে প্রতি ১লিটার = ৩লিটার পানি মিশিয়ে ছেঁকে নিয়ে ফসলে স্প্রেয়ার মেশিন দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। ইহা ফলিয়ার হিসেবে কাজ করে।

গো-চনা সার বা ফলিয়ার:

দেশী গাভীর চনা বা মূত্র সংগ্রহ করে মাটির পাত্রে নিতে হবে। মাটির পাত্র ভালোভাবে এয়ারটাইট করে বেঁধে মাটিতে গর্ত করে ১৪ দিন পুঁতে রাখতে হবে। ১৪ দিন পর মুখ খুলে ১ ফোঁটা পানি দিয়ে দেখতে হবে বুদবুদ হচ্ছে কিনা। বুদবুদ হলে সার তৈরি হয়েছে। না হলে আরও ৭ দিন মাটির নীচে পুঁতে রাখুন। ১ লিটার পঁচানো গো-চনা এর সাথে ৫/১০ লিটার পানি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এটা উপরি সার বা ফলিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যায় এবং পাশাপাশি পোকা দমনেও কার্যকর।

জীবানু সার: জীবানু যখন মাটিতে পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি মেটানোর জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন তাকে জীবানু সার বলা হয়। অন্য কথায় জীবানু যখন সার হিসাবে ব্যবহার হয় তখন তাকে জীবানু সার বলে। এই সার সাধারনত ল্যাব-এ তৈরি করা হয়। বিভিন্ন প্রকার জীবাণু ও পিট মাটি এই সার প্রস্তুতির দুটি কাঁচা মাল।

জীবাণু সারের উপকারিতা:

- তরল সার উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান সরবরাহ করে।
- খাদ্যোপাদানসমূহ উদ্ভিদের জন্য তাড়াতাড়ি সহজলভ্য হয়।
- ইহা খুব সহজে এবং কম খরচে প্রস্তুত করা যায়।
- উচ্ছিষ্ট পাতাগুলো পুনরায় কম্পোষ্টে ব্যবহার বা মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া যায়।
- তরল সার অতিরিক্ত ব্যবহারেও কোন ক্ষতি করে না।
- শীত মৌসুমে তরল সার খাদ্যোপাদানের পাশাপাশি পানির ঘাটতি পূরণ করে থাকে।
- পাতা জাতীয় সবজির দ্রুত বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

সবুজ সার ও এর উপকারিতা

সবুজ সার: সবুজ সার এক প্রকার জৈব সার, সীম জাতীয় ফসলকে কচি এবং সবুজ অবস্থায় বা ফুল আসার আগে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে যে সার তৈরি করা হয় তাই সবুজ সার হিসাবে পরিচিত। সবুজ সার হিসাবে ধৈইঞ্চা, মটর, খেসারি, মাষ কলাই, শনপাট, ফেলন ডাল ইত্যাদি ফসলের চাষ করা ভালো।

ক. সবুজ সার যেখানে তৈরি হয় সেখানেই ব্যবহৃত হয়;

খ. সবুজ সারের জন্য ডাল জাতীয় ফসল বা ধৈইঞ্চা চাষাবাদ করলে জমির উর্বরতা ও শস্য পর্যায় বজায় থাকে;

গ. সবুজ সারের গাছকে ফুল আসার আগেই মাটির সাথে মিশে দিলে ২ সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ পঁচে যায়।

সবুজ সার তৈরি:

যেকোনো জমিতে সবুজ সার করতে হলে জমিটি ২-৩টা চাষ দিতে হবে তাতে প্রয়োজনমতো জৈব সার বা পঁচা গোবর দিতে হবে। তারপর প্রতি শতাংশে ১৫০-২০০ গ্রাম হারে ধৈইঞ্চা বা অন্যকোন ডাল বীজ বপন করতে হবে। বীজ বপনের ৬৫-৭০দিনের মধ্যে অর্থাৎ ফসলে ফুল আসার আগেই তা ভালোভাবে লাঙ্গল ও মই দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। গাছ যদি বেশি লম্বা হয় তাহলে কাস্তে দিয়ে কেঁটে ছোট করে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে।

সবুজ সারের উপকারিতা:

- মাটির জো নির্ণয় করে মাটির গঠন ও নমনীয়তাকে উন্নত করে ফলে মাটির পানিধারণ ও পুষ্টিধারণ ক্ষমতা বাড়ে এবং বাতাস চলাচল সহজ হয়;
- সবুজ সার জমিতে জৈব পদার্থ সরবরাহ করে এবং মাটির উর্বরতা বাড়ায়;
- মাটির উপকারি জীবাণুর সক্রিয়তা বাড়ে ফলে ব্যবহৃত সারের উৎকর্ষ বেড়ে যায়। পুষ্টি মৌলের চুঁইয়ে যাওয়া অপচয় কমে;
- মাটির উপকারি জীবাণু ও অণুজীবের সক্রিয়তার ফলে সবুজ সার মাটির গভীর স্তরের পুষ্টি কণাকে উপরের স্তরে এনে ফসলে জোগান দেয়;
- অম্ল মাটির অম্লত্ব কমাতে ও কখনও কখনও লবনাক্ত ভাব কমাতে সবুজ সার যথেষ্ট সহায়ক;
- বিঘা প্রতি ১০-৩০ কুইন্টাল পর্যন্ত জৈব সার মাটিতে যোগ হয়, যা মাটিকে প্রাণবন্ত রাখে;
- ধৈইঞ্চার সবুজ সার বাতাসের মুক্ত নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে বিঘা প্রতি ৮-১৩ কেজি নাইট্রোজেন পুষ্টিকণার জোগান দেয় যা ১৮-২৮ কেজি ইউরিয়ার সমান;
- সবুজ সার জমি ঢেকে রাখায় ক্ষয় রোধ হয়, মাটির রস সংরক্ষিত থাকে এবং অ-কৃষি শস্যেও উপদ্রব কম হয়;
- সবুজ সার ব্যবহারে ফসলে রোগ-বালাই কম হয়;
- সবুজ সারে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ, জিংক, ক্যালসিয়াম সহ ফসলের অন্যান্য খাদ্য উপাদান থাকে বজায় থাকে;
- রাসায়নিক সারের তুলনায় খরচ খুব কম হয়;
- পরিবেশের কোন ক্ষতি করে না।

নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম সমৃদ্ধ জৈব সার তৈরি ও ব্যবহার:

যে কোন কম্পোস্ট বা জৈব সারে কিছু না কিছু নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম, জিংক, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি পাওয়া যায়, তথাপি বিশেষ কিছু জৈব উপাদান ব্যবহার করে এগুলোর ঘাটতি মেটানো সম্ভব। যেমন-

নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ জৈব সার: সরিষা খৈল, তিল খৈল, তিসি খৈল, বাদাম খৈল, সয়াবিন খৈল, পশু-পাখির শুকনো রক্ত, দেশীয় গবাদি পশুর মূত্র, ধৈইঞ্চা, শনপাট ইত্যাদিতে অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। খৈল-এর মধ্যে সবচাইতে বেশি নাইট্রোজেন পাওয়া যায় বাদামের খৈলে। তাছাড়া আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে এবং বৃষ্টির পানিতে প্রাকৃতিক ভাবে নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। জলাধার সৃষ্টি করে প্রয়োজনে বৃষ্টির পানি ধরে রেখে সেই পানি ব্যবহার করলে নাইট্রোজেনের অভাব দুর করা যায় এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির চেয়ে বেশি উপকার পাওয়া যায়।

ফসফরাস সমৃদ্ধ জৈব সার: বিভিন্ন পশু-পাখির হাড়ের গুড়া, শুটকী মাছের গুড়া, মাছ ধোয়া পানি, পঁচা কচুরীপানা ব্যবহার করে ফসফরাস সমৃদ্ধ জৈব সার পাওয়া যায়। এছাড়াও ফসফরাস কালচারের মাধ্যমে ফসফরাসের অভাব পুরুণ করা যায়। যেমন- কচু, ধান, ঘাস ও লজ্জাবতীর শিকড়ে এক ধরনের ছত্রাক থাকে, এই ছত্রাক অদ্রবনীয় ফসফরাসকে দ্রবনীয় আকারে রূপান্তর করে যা গাছ সহজে গ্রহণ করতে পারে। এই ছত্রাকের মাইলেসিয়াম মূলের ঠিক কাছাকাছি থাকে। আবার সীম জাতীয় ফসল ও ধৈইঞ্চার শিকড়ে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া নডিউল তৈরি করে বাতাসের নাইট্রোজেনকে আবদ্ধ করে গাছের গ্রহণ উপযোগি আকারে নিয়ে আসে। এসব ছত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়াসমৃদ্ধ উদ্ভিদের শিকড়কে মাটিসহ তুলে আনতে হবে এবং তা ভেঙ্গে মাটিতে বিছিয়ে দিতে হবে এবং তার উপর গাছের সবুজ লতাপাতাগুলি বিছিয়ে দিয়ে তার উপর পরিমাণমতো পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। এভাবে পরপর তিন দিন হালকা পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।

সাত দিন পর কাঠি দিয়ে পাতা ও শিকড় বিছানো মাটিতে কতোগুলো ফুঁটো করতে হবে এবং পাতার উপর আগে থেকে সংগৃহীত কিছু কাঠ কয়লার গুড়ো ছিটিয়ে দিতে হবে। উপকরণটি এভাবে এক মাস রাখতে হবে এবং মাঝে মাঝে অল্প পরিমাণ পানি ছিটাতে হবে। একমাস পর উপকরণের নীচের মাটির রঙ সাধারণ মাটি থেকে আলাদা দেখাবে। পাতাগুলো সরিয়ে দিলে কাঠ কয়লা গুলো মাটির সংস্পর্শে আসবে এবং নতুন পাতা দিয়েমাটিকে ঢেঁকে দিতে হবে। কাঠ কয়লার অসংখ্য ছিদ্র থাকে যেখানে উপকারি ছত্রাক বাসা তৈরি করবে। উপকরণটি আরও ১০ দিন রেখে দিন এবং তারপর জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। ১ বিঘা জমিতে ১০ কেজি পরিমাণ ছিটাতে হয়। ইহা ব্যবহার করলে জমিতে কোন রাসায়নিক টিএসটি এবং ডিএপি সার ব্যবহার করতে হবে না। একটা ফসলে এই ফসফরাসসমৃদ্ধ সার ২-৩ বার ব্যবহার করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

শুস্ক সময়ে এই পদ্ধতিতে ফসফরাস সার তৈরি করে রেখে দিতে হবে। আর কাজটি শুরু করার পূর্বেই জায়গাটি প্রথমে পরিস্কার করে মাটিতে চুন মিশিয়ে ৫-৭ দিন রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হবে, যাতে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া মারা যায়।

ফসফরাস সমৃদ্ধ জৈব সার তৈরি

জৈব পটাসিয়াম সার: বাড়িতে রান্না করার চুলার ছাই, কাঠালের মুচি পোঁড়ানো ছাই, বিভিন্ন প্রকার কাঠ কয়লার ছাই (দেশীয় প্রজাতির গাছের কাঠ) ইত্যাদি ব্যবহার করে পটাশিয়ামের ঘাটতি পুরুণ করা সম্ভব। পটাশিয়াম ছাড়াও ছাইয়ে অল্প পরিমাণ ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম এবং ফসফরাস থাকে।

জিংকসমৃদ্ধ সার: ৮০ দশক হতে আমাদের দেশের কৃষিতে রাসায়নিক জিংক ব্যবহার শুরু হয়েছে, কিন্তু আমাদের হাতের নাগালেই আছে প্রাকৃতিক জিংকসমৃদ্ধ নানা ফল যেমন-চালতা, তৈকর ও সাতকরা। এগুলির মধ্যে চালতা ও তৈকর দামে বেশ সস্তা। তৈকর ও সাতকরা সব এলাকাতে পাওয়া না গেলেও চালতা এমন কোন এলাকা নেই যে সেখানে পাওয়া যায় না। চালতা বা তৈকর দিয়ে জিংকসমৃদ্ধ তরল জিংক সার তৈরি করতে হলে ৫ টি পোক্ত চালতা বা তৈকর কুঁচি কুঁচি করে কেঁটে একটা মাটির হাঁড়িতে ১০লিটার পানি নিয়ে চালতা কুঁচিগুলি দিয়ে এয়ারটাইট করে শুস্ক ও ছায়ায় ২১-২৮ দিন রাখলে তৈরি হয়ে যাবে জিংক সমৃদ্ধ তরল সার। ২৮দিন পর দ্রবণটি ছেঁকে নিয়ে তার সাথে আরও ৫০-৬০ লিটার পরিস্কার পানি যোগ করে ১ বিঘা জমির ফসলে বা গাছে স্প্রে করা যায়।

উচ্চমাত্রার জিংকসমৃদ্ধ ফল: চালতা, তৈকর এবং সাতকরা

জৈব সারের সুবিধা-অসুবিধা

জৈব সারের সুবিধা:

- মাটির জন্য উপকারী। জৈব সারে মাটি জীবন্ত থাকে। মাটির ক্ষয় কম হয়। মাটিতে প্রয়োজনীয় পানি ধরে রাখে ফলে সেচ এর প্রয়োজন পরেনা;
- জৈব সার উৎপাদন খরচ কম। নিজে তৈরি করা যায় বলে পরনির্ভরশীলতা কমে;
- জৈব সার পরিবেশের জন্য সহায়ক। ইহা ব্যবহারে জমিতে প্রচুর কেঁচো ও উপকারী ব্যাকটেরিয়া উৎপন্ন হয়। এক একর জমিতে ৯০০ পাউন্ড কেঁচো থাকলে জমির জৈব পদার্থের আদর্শমান বজায় থাকে;
- নিয়মিত জৈব সার জমিতে প্রয়োগ করলে আস্তে আস্তে জমিতে রাসায়নিক সারের প্রয়োজনীয়তা ফুঁরিয়ে যাবে;
- জৈব সার ব্যবহারে অ-চাষকৃত ফসল (আরন্যক যে সকল শাক-সবজি হয়) বেশি পাওয়া যাবে;
- জৈব সার ব্যবহারে কৃষকের ক্রমশঃ ব্যয়হ্রাস পায় এবং জাতীয়ভাবে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়।

জৈব সার তৈরি ও ব্যবহারের চ্যালেঞ্জ

- এখন সকল কৃষকের ঘরে জৈব সার তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ নেই, অর্থাৎ খুব বেশি কৃষকের ঘরে এখন গরু, গোবর, খৈল এবং আবর্জনা নেই;
- পরিশ্রম করে নিজে বানাতে হয় জন্য কৃষক জৈব সার ব্যবহার করতে চান না;
- রাসায়নিক ব্যবহারে দ্রুত লাভবান হওয়ার মনোভাব।

৫.৫. পবিবেশবান্ধব উপায়ে জমি বা মাটি তৈরি ও উন্নতকরণ:

আমরা জানি প্রাকৃতিক উপায়ে ভৌত রাসায়নিক ও জৈবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ১ ইঞ্চি বা ২.৫৪ সেন্টিমিটার টপ সয়েল হতে হাজার বছরের বেশি সময় লেগে যায়, অথচ এই টপ সয়েলকে আমরা নানাভাবে বিনষ্ট করছি। যেমন- ইট ভাটায় টপ সয়েল চলে যায়, পুকুর বা খাল কাটলে টপ সয়েল মাটির নীচে চাপা পরে যায়। তাই পরিবেশবান্ধব

কৃষিতে জমির উপরিস্তর বা টপ সয়েল রক্ষার জন্য কোন আপোষ করা হয়না এবং জমি কর্ষণের কোন সুযোগ নেই। কিন্তু আমাদের দেশের অধিক জনসংখ্যা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা চিন্তা করে জমির মাটি তৈরিতে কিছুটা আপোষ করতে হয়। তাই আমাদের ফসল ফলাতে শস্য চক্র এমনভাবে সাজাতে হবে যে মাটি বছরে একবার কর্ষণ করে বা চাষ দিয়ে যেন সারাবছর কয়েকটা ফসল ফলানো যায়। যেমন-

নদী অববাহিকায় বন্যা পরবর্তী সময়কে মাথায় রেখে বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে কর্দামাক্ত পলি মাটিতে যাতে কোন প্রকার চাষ না দিয়েই ফসল ফলানো যায় সে জন্য কৃষকের একটা বুদ্ধিদীপ্ত বা চৌকস পরিকল্পনা থাকতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে বাংলাদেশের বিস্তৃর্ণ চরাঞ্চলে বর্ষার শেষে অক্টোবর মাসে জমি চাষ না দিয়েই তাতে বিভিন্ন রকম ডাল জাতীয় শস্য বুনতে হবে। সাথে সঙ্গী ফসল হিসেবে রাই সরিষা, ধনিয়া, গম, জব ইত্যাদি লাগানো। আবার বৃহত্তর ফরিদপুর ও বৃহত্তর পাবনা এবং নাটোর এলাকায় বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে পেঁয়াজ, রসুন, সরিষা, ধনিয়া, কালোজিরা, তিষি, জব, গম, ওটস, মরিচ ইত্যাদির মিশ্র চাষ করা। এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে কোন ফসলের সাথে কোন কোন ফসল সঙ্গী হিসেবে দেয়া যায়।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে কাদা মাটিতে যদি আখ বা ইক্ষু প্রধান ফসল হিসেবে লাগানো যায় তবে ঐ সময় তার সঙ্গী ফসল হিসেবে বিভিন্ন ডাল জাতীয় ফসল এবং সরিষা, মূলা, পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ ইত্যাদি দেয়া যেতে পারে। এখানে মূল ফসল হলো আখ, তার সঙ্গী ফসল হিসেবে আচ্ছাদন ও নাইট্রোজেন আবদ্ধকারি ফসল হলো বিভিন্ন ডাল (খেসারী, মুগ, বাদাম, মটর, মশুর, ছোলা ইত্যাদি) ফাঁদ ফসল হলো চুকাই,/মেস্তা, সরিষা এবং মূলা, পেঁয়াজ ও রসুন হলো পোকা-মাকড় বিতাড়ক।

মটর কলাইয়ের ক্ষেত

পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা অববাহিকাসহ দেশের ছোট-বড় আরও অন্যান্য নদী এলাকায় বর্ষা শেষে বিনা চাষে স্থানীয় লোকজন স্থানীয় জাতের ধান চাষ করে। এখানে সাথী ফসল দেয়ার খুব একটা সুযোগ নেই তথাপি আগাম করে কিছু ধৈইঞ্চা এবং সোলা উক্ত ধানের মাঝে বসিয়ে দিলে লাইভ পার্চিং হিসেবে কাজে লাগানো যায়।

লক্ষী দীঘা ধানের ছবি

পাহাড়ে জুমের জন্য জমি চাষ দিতে হয় না। সেখানে জুম চাষে ধানের সাথে তারা কলা, কচু, তিল, মরিচ, বিভিন্ন প্রকার সবজি, আদা, হলুদ সহ তাদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ফসল লাগায় এবং পাহাড়ের ভূমিক্ষয় রোধে পাহাড়ি জনগোষ্ঠি তাদের জমিতে প্রয়োজনীয় পুরুত্বে মালচিং করে রাখে।

পাহাড়ী ফসল

সমতলে জমি তৈরি: যেহেতু আমাদের কৃষিতে বিগত ৬-৭ দশক হলো রাসায়নিক ব্যবহারের পরিমাণ বেড়েছে এবং তা সমতলভূমিতেই বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই সমতলে জমি প্রস্তুত করাও একটা চ্যালেঞ্জিং বিষয়। সবুজ বিপ্লবের নামে কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ করার ফলে আমাদের ঐতিহ্যবাহী গরুর হাল হারিয়ে গেছে। কৃষি কাজে আপাতত দৃষ্টিতে গতি এসেছে কিন্তু জটিলতা ও ব্যয় বেড়েছে বহুগুনে।

সমতলে চাষাবাদ করলে –

১. বলদের লাঙ্গল দিয়ে জমি চষা ও মই দেয়া এবং যথাসম্ভব কম ভূমি কর্ষণ করা;

২. জমিতে মই দেয়ার সময় জমির ঢাল এমনভাবে রাখতে হবে যে উপরের অংশ ধুয়ে না যায় আবার এটাও খেয়াল রাখতে হবে যাতে করে জমির পানি নিষ্কাশন ভালোভাবে হয়;

৩. আচ্ছাদন পদ্ধতিতে ফসল ফলাতে হলে সকল জৈব সার ভিত্তি প্রয়োগেই দিয়ে দিতে হবে; নির্দিষ্ট জমির পানি ও ভূমি সংরক্ষণে ধৈইঞ্চা, ডাল জাতীয় ফসল এবং সম্ভব হলে সবজি চাষ করা। আচ্ছাদনের যথাযথ ব্যবস্থা করে মৃত্তিকা রসের অপচয় রোধ করা;

গরুর লাঙ্গল (ছবি: নেট থেকে নেয়া)

৪. সবজির লতাপাতা দিয়ে কম্পোস্ট করে ধান চাষে প্রয়োগ আর খড়ের কম্পোস্ট সবজিতে প্রয়োগ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়;

৫. অপ্রচলিত ফসলের আবাদ বাড়ানো যাতে করে জমি কর্ষণ করতে না হয় যেমন-মানকচু, ওলকচু, সজিনা, থানকুনি, পুদিনা, আনাজী কলা, দেশী কলমীশাক, কাঁটানটেশাক ইত্যাদি;

৬. সমতলে যে কোন একটি ফসলকে প্রধান ফসল ধরে চাষাবাদ করলে ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং-এর মূলনীতি মেনে চলা সহজ হয় এবং চাষাবাদ ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে করা সম্ভব হয়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়- কোন একটা

আবাদের ক্ষেত্রে 'পটল' হলো মূল ফসল। এজন্য প্রথমে জমি তৈরি করে পটল লাগানোর এক লাইন থেকে আরেক লাইনের দূরত্বের ফাঁকা জায়গায় ৪-৫ সারি আলু করা যায় এবং পটলের সারিতে যে ফাঁকা জায়গা থাকবে সেখানে বিতৃষ্ণা ফসল হিসেবে পেঁয়াজ-রসুন ও অল্প কালোজিরা অথবা ধনিয়া দিতে হবে। আর আলুর মাঝে ১ বিঘা জমিতে ৫০ গ্রাম মূলা বীজ, ২৫ গ্রাম রাই সরিষা বীজ ও ১০০ গ্রাম ধনিয়া বীজ ছিটিয়ে রাখতে হবে। মূলা হবে বিতৃষ্ণা ফসল আর সরিষা হবে ফাঁদ ফসল যা আলুর জাব পোকা দমনে সহায়তা করবে। অপরপক্ষে ধনিয়া হবে কৃমি প্রতিরোধী যা পটলের জমিতে খুব প্রয়োজন, কেননা পটলের শিকড়ে প্রচুর কৃমি বা নেমাটোড আক্রমণ করে তাই ধনিয়া থাকলে পটলে কৃমি আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম হয়। আলু উঠে গেলে পটলের মাঁচা করে মাঁচার নীচে দুই পার্শ্ব দিয়ে আদা এবং তার ফাঁকে ফাঁকে কিছুটা বর্ষালি মরিচ দেয়া যেতে পারে। তাছাড়া পুরো জমিতে অল্প কিছু লালশাক, পুঁইশাক, ডাটা, কলমীশাকের বীজ ছিটিয়ে রাখতে হবে। যা স্বল্প সময়ে হবে এবং পর্যায়ক্রমে তুলে বাজারজাত করা যাবে। এছাড়াও পটল ক্ষেতের চারপাশে অথবা মাঝখানে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু ঢেঁড়স লাগালে তা পটলের জন্য ফাঁদ ফসল হিসেবে কাজ করবে। সর্বশেষ সাথী ফসল হিসেবে পটল ক্ষেতের চারপাশ দিয়ে কিছু কিছু হলুদ লাগানো যেতে পারে। আদা ও হলুদ হবে পটলের জন্য পোকা বিতাড়ক ও ছত্রাক প্রতিরোধী ফসল। তাছাড়া পটলের জমির চারপাশে ১৫-২০ টি পেঁপে গাছ ও কিছু অড়হড় ডাল গাছ লাগালে সেটা ফসলে পার্চিং হিসেবে কাজ করবে। পাশাপাশি অড়হড় ডাল গাছ জমিতে নাইট্রোজেন নিঃসরণ করবে।

প্রধান ফসল পটল সাথে আলু ও রসুনের ছবি

৬ষ্ঠ পাঠ

মাটি সুরক্ষার কৌশল নিশ্চিতকরণ

বহুকাল ধরে বিরামহীনভাবে জমিতে চাষাবাদ করলে এবং ভূমির উপরিস্তরে ক্রমাগতহারে রাসায়নিক সার ও বিষ প্রয়োগ করার ফলে ভূমিক্ষয় হয় এবং জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পায়। পাশাপাশি বায়ু, পানি এবং সূর্য্যের আলো দ্বারা ক্রমশঃ ক্ষয় হতে থাকে এবং ভূমি অনুর্বর হয়ে যায়। কেননা মাটি সাধারনত বৃষ্টিপাত-এর মাধ্যমে ধুয়ে যায়, বাতাস-এর মাধ্যমে উড়ে যায় এবং সূর্য্যের তাপে শুষ্ক হয়ে যায়। বাংলাদেশে কৃষিজমির অনাবৃত মাটি এবং বর্ষা মৌসুমের প্রবল বৃষ্টিপাতই ভূমিক্ষয়ের অন্যতম কারন। এছাড়া অতিরিক্ত কর্ষণও অনেক সময় ভূমিক্ষয়ের কারন হয়ে দাঁড়ায়। তাই রাসায়নিক ব্যবহার বন্ধের পাশাপাশি উল্লেখিত তিনটি উপাদান যাতে সরাসরি মাটিতে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য প্রথমে ভূমিক্ষয় রোধ করা এবং তারপরে মাটিকে সুরক্ষা দিতে হবে।

৬.১.ক. মাটির ক্ষয়রোধ

সরাসরি বৃষ্টির পানি যাতে করে মাটিতে আঘাত করতে না পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারন বৃষ্টির পানিতে মাটির উপরিস্তর ধুয়ে ধুয়ে নীচের স্তরের মাটি প্রকাশ পায়। সাধারণত মাটিতে পানি দ্রবীভূত হয়ে পলিমাটির অংশ বেরিয়ে যায় এবং ক্রমশ বালির ভাগ বাড়তে থাকে। আবার বেলে-দোঁআশ মাটি ক্ষয় হতে হতে দোঁআশ-বেলে তারপর বেলে মাটিতে পরিনত হয়। তাই ফসল ফলাতে গেলে কখনই কোন একক ফসল চাষাবাদ করা যাবে না। এক্ষেত্রে শস্য বহুমুখী ও শস্যবৈচিত্র্যায়ন করে মূল ফসলের সাথে আচ্ছাদন ফসল লাগিয়ে মাটি ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। যেগুলিতে আচ্ছাদন ফসল করা সম্ভব হবে না বা মৌসুমের সাথে মিলবে না সেখানে কচুরীপানা, শুকনো খড়, শুকনো লতাপাতা, বিভিন্ন ফসলের উচ্ছিষ্ট, কোকোপিট বা কোকোডাষ্ট, উড চিপস (গাছের বাকল থেকে তৈরি) ইত্যাদি দিয়ে কমপক্ষে ৪-৬ ইঞ্চি পুরুত্ব করে মাটি ঢেঁকে রাখতে হবে। যাতে করে পানি, বায়ু এবং সূর্য্যের আলো ইত্যাদি ভূমিকে সরাসরি কোন আঘাত করতে না পারে। কোনো কোনো আচ্ছাদন ফসল ও অকৃষি শস্যকে জীবন্ত আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহার করা যায় যেমনঃ ডাল জাতীয় ফসল, ধৈইঞ্চ্যা, শনপাট আবার কিছু অকৃষি ঘাস বা তৃণ, গুল্ম ও বৃক্ষের শিকড় ভূমিক্ষয় রোধ করতে সক্ষম হয়। যেমনঃ বোরোচেইচ, ছাগলগাছা, কাকপায়া, চাপড়া ইত্যাদি ঘাস এবং লজ্জাবতী, নল ঘাগড়া, ছন, লেমন ঘ্রাস, কেয়া, কাঁটাবেগুন ইত্যাদি গুল্মের শিকড় ভূমির ক্ষয়রোধ করতে পারে। আবার হাওর এলাকায় বাঁশ, করচ ইত্যাদিও ভূমিক্ষয় রোধে

সহায়ক হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক আচ্ছাদন দিয়ে মাটির উপরিভাগ ঢেকে দিলে ১ একর জমিতে বছরে ৫০ টন ভূমিক্ষয় রোধ করা সম্ভব।

আচ্ছাদন পদ্ধতিতে আলু চাষ

তাছাড়াও একটা পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, আচ্ছাদন প্রক্রিয়ায় তিনভাগের দুইভাগ শুকনা দ্বি-বীজ পত্রী উদ্ভিদের খড় (সবধরণের ডাল ও সীম জাতীয় শস্য বীজ) এবং তিনভাগের একভাগ এক-বীজপত্রী উদ্ভিদের (ধান-গম) খড় দিয়ে মালচিং বা আচ্ছাদন করলে জমিতে এগুলি পঁচে উৎকৃষ্ট হিউমাস সৃষ্টি হবে, যার মধ্যে অধিক পরিমাণে কার্বন এবং নাইট্রোজেন ধারণ করবে।

গাছের বাকল দিয়ে আচ্ছাদন (উড চিপস)

৬.১.খ. কৃষি কাজের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানি খুব প্রয়োজন না হলে তা উত্তোলণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলণের ফলে মাটির খনিজ পদার্থ সংরক্ষণে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়।

৬.২. মাটি সংরক্ষণের উপায়:

ক. প্রথমেই ভূমির জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার (মাত্রাতিরিক্ত এনপিকে, আগাছানাশক ইত্যাদি) ব্যবহার বন্ধ করতে হবে;

খ. মাটি পরীক্ষা করে কি কি ঘাটতি আছে তা পূরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

গ. মাটিকে সংরক্ষণের আরেক কৌশল হলো মাটিতে সবসময় কিছু না কিছু দিতে হবে অর্থাৎ মাটি থেকে কিছু আহোরণ করতে হলে তাতে আবার কিছু না কিছু জৈব পদার্থ দিতে হবে;

ঘ. মাটিকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জীবন্ত ফসল ও জৈব জড় পদার্থ দিয়ে ঢেঁকে রাখতে হবে;

ঙ. শস্য চক্রে লিগুম জাতীয় ফসলের চাষ করা;

চ. শস্যবৈচিত্র্য আনয়ন করে চাষাবাদ করলে ভূমি সংরক্ষণ করা যায়;

ছ. ফসলের অবশিষ্টাংশ জমিতে মিশিয়ে দেওয়ার ফলে ভূমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়;

জ. জমিতে একক ফসল না করে সবসময় মিশ্র ও আন্তঃফসলের চাষ করা;

ঝ. শস্য পর্যায়/শস্যাবর্তন অবলম্বন করে চাষাবাদ করা;

ঞ. ধানের জমিতে অ্যাজোলা ব্যবহার করে চাষাবাদ করা।

ট. মাটিকে ধীরে ধীরে আরণ্যক ভূমি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

৭ম পাঠ

কৃষিতে স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

কৃষক যদি তাদের ঘরে সার ও কীটনাশকের ফ্যাক্টরী বা কারখানা তৈরি করে তবে তাকে কেউ বাঁধা দিবেনা এবং রাসায়নিক ব্যবহারে কেউ বাধ্য করতে পারবেনা। তাই কৃষককে বাঁচতে হলে এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হতে হলে অবশ্যই স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে গবাদি পশু-পাখি পালনের বিকল্প নেই, গবাদি পশু পাখি পালন করে দেশীয় গরু-মহিষের গোবর-মূত্র, ছাগল ও ভেড়ার নাদি, গৃহপালিত হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা, কিচেন গার্বেজ, পঁচনশীল সকল প্রকার জৈব উপাদানের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি বালাইনাশক হিসেবে স্থানীয় উপকরণ ও গাছ-গাছড়া ব্যবহার করতে হবে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, জৈব কৃষির জন্য আমাদের গৃহস্থালির কোনটিই ফেলনা নয়, বরং সমস্ত কিছুই পুণঃচক্রায়ণ প্রক্রিয়ায় কাজে লাগে। যেমন:

১. গবাদি পশু-পাখির মল-মূত্র
২. জবাইকৃত পশু-পাখির রক্ত, হাড়-গোড়
৩. মাটির চুলার ছাই
৪. সবজির খোসা
৫. বিভিন্ন মিষ্টি ফলের খোসা
৬. পঁচনশীল সকল জড় পদার্থ
৭. বসতবাড়ির ময়লা আবর্জনা
৮. ডিমের খোসা
৯. মাছ ধোয়া পানি, চাল ধোয়া পানি, ডাল ধোয়া পানি
১০. ব্যবহৃত চা পাতি
১১. ধানের খড়কুটা
১২. বিভিন্ন গাছের লতা-পাতা/ ফল/বীজ ইত্যাদি
১৩. ফসলের ডাল-পালা
১৪. ধানের কুঁড়া/ কাঠের গুড়া ইত্যাদি

৮ম পাঠ

বীজ ব্যবস্থাপনা

বীজ উৎপাদন ও সংগ্রহ হলো একটি বিজ্ঞানসম্মত ও প্রযুক্তগত কর্মকান্ড। বীজ উৎপাদনের প্রথম কাজ হলো বীজের গুনাগুন সংরক্ষণ করা। নির্দিষ্ট জাতের নির্দিষ্ট এবং মানসম্মত বীজ বলতে গুনগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন এবং বীজ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণকে বুঝায়।

৮.১ বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

১৯৭০ সালের আগ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র যাবতীয় শস্যবৈচিত্র্যের ভান্ডার ছিলো কৃষকের হাতে। এই উপমহাদেশের প্রতিটি শস্য প্রজাতি ও তার অজস্র জাত কৃষকরাই সৃষ্টি ও সংক্ষরণ করেছিলেন। যা তারা নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান বা বিনিময় করতেন। এভাবেই হাজার হাজার প্রজাতির শস্য বীজ সারা উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিলো। এই জাতগুলির মধ্যে জলবায়ু সহিষ্ণু বা খড়া সহনশীল ও বন্যাসহনশীল, লবনসহনশীল, বিভিন্ন রোগ ও শত্রু পোকা প্রতিরোধী বিভিন্ন জাতের ফসল দেশের বিভিন্ন এলাকা বা অঞ্চলে চাষাবাদ করা হত। স্থানীয় জলবায়ু ও স্থানীয় পরিবেশে খাপ খাওয়ানো এসব জাতের বীজ কৃষকরা বিনামূল্যে নিজেরা নিজেদের মধ্যে বিনিময় করতেন। এক্ষেত্রে টাকা-পয়সার কোন লেনদেন ছিলোনা। শস্য বীজকে তাই বলা হত সামূহিক সম্পদ, যার উপর কোন ব্যক্তির মালিকানা ছিলো না। উল্লেখ যে, উপমহাদেশে শুধুমাত্র ধানের জাতই ছিল ৮২,৭২৬টি, আর সমগ্র বাংলায় তা ছিলো ৫৫০০-এর উপরে। গমের জাত ছিলো ৩৮,০০০টি, ভুট্টার জাত ৭,২৬১টি, জোয়ার ১৮,০০০টি, ছোলা ১৬,০০০টি, বেগুনের জাত ছিলো প্রায় ৩,৮৬৮টি।

সূত্রঃ ভালো থাকার অভিপ্রায়, ভিডিও, ড. অনুপম পাল, উপসহকারি কৃষি অধিকর্তা, পুরুলিয়া।

কিন্তু ৭০ দশকের শুরু থেকে সবুজ বিপ্লবের ধারক-বাহকগণ বীজকে বাণিজ্যিকভাবে বাজারে নিয়ে আসে এবং পাশাপাশি হাইব্রীড ও জিএমও এবং বামন জাতের বীজ আবিস্কার করে। আর এই সকল বীজকে এমনভাবে তৈরি করা হলো যাতে করে সেগুলো অনেক পরিমাণ রাসায়নিক সার ও রাসায়নিক বিষ খেতে পারে। তৈরি হলো বীজ কোম্পানি, গড়ে তুললো বীজের বাজার ব্যবস্থাপনা, দখল নিলো বীজের বাজার। সরকারি প্রচেষ্টায় এই সমস্ত বীজ ছড়িয়ে দেয়া হলো সারাদেশে। যা সরকারি কৃষি গবেষণাগার বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হতে লাগলো। গবেষণাগারের প্রস্তুতকৃত কিছু বীজ কৃষকরা উৎপাদিত ফসল থেকে করতে পারেনা। আবার কিছু বীজ করতে পারলেও তা ২ বছরের বেশি হাতে রাখতে পারেনা, ফলন কমে যায়। অতএব ২-৩ বছর পর কৃষক কোম্পানীর নিকট হতে বীজ কিনতে বাধ্য হয়। এতে করে ক্রমশঃ কৃষকের বীজ মূল্যহীন হয়ে পড়লো, কৃষক আগ্রহ হারিয়ে ফেললো বীজ সংরক্ষণে।

বীজের উপর পরম্পরাগত সামুহিক অধিকার আবারও প্রতিষ্ঠা করতে গেলে, প্রথমেই বীজ বিনিময়ের সাবেকী প্রথা ফিরিয়ে আনতে হবে। অথবা স্থানীয়ভাবে আগ্রহী ও অভিজ্ঞ কৃষকদের মাঝে বীজ উৎপাদক তৈরি করতে হবে যিনি দেশীয় বীজ উৎপাদন করে কৃষকদের মাঝে স্বল্পমূল্যে বিতরণ করবেন। এখনও দেশের আনাচে-কানাচে বহু উদ্যোগী আছেন যারা নিজের তাগিদে স্থানীয় জাতের দেশীয় বীজ সংরক্ষণ ও বিতরণ করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাজশাহী তানোর উপজেলার ধান বীজ সংরক্ষণকারী জনাব মোঃ ইউসুফ মোল্লা যার সংগ্রহে ৩৫০ প্রকার দেশীয় জাতের ধান বীজ সংগ্রহে আছে। যিনি সম্প্রতি পরলোক গমন করেছেন (১৪ জানুয়ারী,২০২২), আরেকজন হলেন সাতক্ষীরার শ্যামনগরের অঞ্জনা রানী মিস্ত্রী, যিনি এখনও ৪০০ প্রকার সবজি ও শস্যের স্থানীয় বীজ সংরক্ষণ করেন।

তথ্য সূত্রঃ দেশীয় ধান বীজ সংরক্ষণে ইউসুফ মোল্লা ও দেশীয় বীজ সংরক্ষণে অঞ্জনা রানী মিস্ত্রির চেনা জানা ইউটিউব ভিডিও এবং লেখক কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শন।

বীজ ব্যাংক: ইউসুফ মোল্লা

বীজ ব্যাংক: অঞ্জনা রানী মিস্ত্রি

বীজ ব্যাংক: তিলোত্তমা প্রাকৃতিক খামার

৮.১.ক. জমি থেকে বিভিন্ন ফসলের বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি

বৈজ্ঞানিক উপায় জানা না থাকলেও কৃষকগণ তাদের প্রচলিত জ্ঞানে বীজ সংগ্রহের জন্য রৌদ্র উজ্জ্বল দিনে ফসলের মাঠ হতে চিহ্নিত বা বাঁছাইকরা গাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য দানা বা ফল সংগ্রহ করতে হবে। সাধারণত দানা শস্য বীজের জন্য কর্তনকৃত ফসল ড্রাম বা মাচায় আড়াই বাড়ি দিলে যে পরিমাণ বীজ ঝরে পড়বে তাই আলাদা করে নিয়ে বাঁছাই করে ভালোভাবে রোদে শুকাতে হবে। অতঃপর মাটির মঠকা বা হাঁড়িতে, টিনের কৌটায় অথবা প্লাষ্টিকের ড্রামে বা পাত্রে এয়ারটাইট অবস্থায় শুস্ক স্থানে রেখে দিতে হবে। পোকা-মাকড় যাতে ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য বীজ ভর্তি পাত্রে শুকনা মরিচ, নীম পাতা, তামাক পাতা দিয়ে রাখলে পোকা-মাকড় ধরেনা এবং পোকা-মাকড়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে যে কোন বীজকে মাঝে মাঝে রোদে দিতে হয়।

সবজি বীজ সংগ্রহ করতে হলে পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই মুক্ত গাছকে চিহ্নিত করতে হবে এবং সম্ভব হলে লক্ষিত গাছের এলাকায় মশারী দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ফল-ফসলের বীজ ৮০% পাকলে বা পরিপক্ক হলে উক্ত বীজ সংগ্রহ করে নিয়ে ভালোভাবে রোদে শুকাতে দিন। অতঃপর তা ঝাড়াই-বাঁচাই করুন। দানাদার শস্য বীজের মত করে মাটির মঠকা বা হাঁড়িতে, টিনের কৌটায় অথবা প্লাষ্টিকের ড্রামে বা পাত্রে এয়ারটাইট অবস্থায় শুস্ক স্থানে রেখে দিন।

৮.১.খ. স্থানীয় উন্নত ও উফশী জাতের বীজ সংগ্রহ

স্থানীয় উন্নত ও উফশী জাতের বীজ সংগ্রহ করার আগে হাইব্রীড বীজ কি তা জেনে নেয়া জরুরী। উদাহরণস্বরূপ নেয়া যাক- বেগুনের একটি জাত যেটি হয়তো দীর্ঘ সময় ধরে খুবই ভালো ফলন দিচ্ছে, কিন্তু তাতে রোগ-বালাই বা পোকা-মাকড় আক্রমণ করছে। অন্যদিকে বেগুনের আরেকটি জাত খুব ভালো ফলন না দিলেও সেটি একদম নীরোগ

থাকতে সক্ষম অর্থাৎ তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। এখন এই দুটি জাত মনুষ্য উদ্যোগে পরাগায়ন ঘটিয়ে যে মিশ্রিত (সংকর) জাতের উদ্ভাবন করা হলো তাকেই হাইব্রিড বলা উচিৎ। অর্থাৎ একই সঙ্গে তার ভালোফলন এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুটোই থাকবে। হাইব্রিড বীজে অনেক গুনের সমাহার ঘটানো যেতে পারে। এই প্রক্রিয়া বেশ ব্যয়বহুল, তাই বীজের দামও বেশি হতে পারে। এই বীজ সাধারণ কৃষকের পক্ষে উৎপাদন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া এই বীজগুলি রাসায়নিক সার ও কীটনাশক খেকো হওয়ায় ফসল উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায় বহুগুনে। ল্যাবরেটরীর তৈরিকৃত বীজ কখনও প্রাকৃতিক নয়, তাই তার বেড়ে উঠা নির্ভর করে আইসিইউ-এর মতো করে সকল উপাদান যথাসময়ে সরবরাহ করতে হবে। অর্থাৎ বীজ কোম্পানীগুলো হাইব্রিড বীজ এমনভাবে তৈরি করেছে যে তাকে সময়মতো রাসায়নিক সার, বিষ, ভূ-গর্ভস্থ পানি এবং বৃদ্ধিকারক হরমোন প্রয়োগ করতে হয়। একটু ব্যতিক্রম ঘটলে ফল ও ফলন বেশ কমে যায়। যদিও কখনও কৃষক হাইব্রিড বীজ রাখে তাতে ল্যাবরেটরীর তৈরিকৃত বীজ থেকে ফসল ফলিয়ে একবার/দুইবার ভালো ফলাফল হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু পরবর্তীতে আর সুবিধার হয়না। কারন এর বিভিন্ন প্রকার সীমাবদ্ধতা আছে।

বিদেশী হাইব্রীড ও জিএমও বীজ বাজারজাতকারী মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিদের চাপে আমাদের দেশে কৃষকদের জন্য এখন ভালো স্থানীয় উফশী ও উন্নত জাতের বীজ পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে গেছে। তাছাড়া স্থানীয় জাত বা নিজে উৎপাদিত বীজ ব্যবহার না করার কারনে প্রায়শঃই কৃষক ফসল ফলাতে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। তাই উন্নত পদ্ধতিতে ভাইরাস ও রোগবালাই মুক্ত স্থানীয় জাত বা নিজে উৎপাদিত বীজ ব্যবহার করতে হবে। চ্যালেঞ্জ হলো আমাদের অনেক স্থানীয় এবং উফশী জাত আজ হারিয়ে যাচ্ছে এবং বিলুপ্তির পথে কিংবা বিলুপ্ত প্রায়। উদাহরণঃ টক টমেটো, গোফরগাঁও বেগুন, ইসলামপুরী বেগুন,রংপুরের খটখটিয়া বেগুন, কদু বা লাউ, বারমাসী মিষ্টি কুমড়া বা জাংলা/ মাচার মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া, চিচিংগা, ঝিংগা/ তরই, সাতপুঁটি, করলা, বিভিন্ন মরিচ, বিভিন্ন ডাল, বিভিন্ন লতা জাতীয় ফসল, বিভিন্ন প্রকার ধান। এজন্য আবার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে কৃষকের কাছে সঞ্চিত আদি হারানো স্থানীয় ও আঞ্চলিক দেশীয় উন্নত ও উফশী জাতের বীজগুলি সংগ্রহ করতে হবে। কারন-

ক. দেশীয় উন্নত বীজ রোগবালাই ও পোকামাকড় সহনশীল;

খ. স্থানীয় বীজ সবসময় প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু ও স্থানীয় জলবায়ু সহনশীল;

গ. দেশী বীজের ফসলের স্থায়ীত্বশীলতা বেশি, বিশেষ করে সবজি গাছ জমিতে টিকে বেশি, ফলে দীর্ঘ সময় ফসল সংগ্রহ করা যায় এবং গড় মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি পাওয়া যায়;

ঘ. নিজ ফসলের বীজ নিজে সংরক্ষণ করা যায়;

ঙ. স্থানীয় উন্নত ও উফশী জাতের বীজে কৃষকের কখনও ক্ষতি হয় না।

সাতপুঁটি বা তরই

উল্লেখিত পদ্ধতি ছাড়াও মানসম্মত বীজ সংগ্রহ বা উৎপাদনের জন্য কৃষি বিশেষজ্ঞগণ নিম্ন উল্লেখিত শর্তসমূহ মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন।

১. **বীজের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ:** বীজের পরিচিতি তার জন্মসূত্র থেকে। অতএব, বীজ উৎপাদন বা সংগ্রহের সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন আকাঙ্খিত বীজের সাথে অন্য কোন বীজের মিশ্রণ না ঘটে;

২. **বীজ ফসলের জায়গা পৃথকীকরণ বা নির্দিষ্টকরণ:** বীজ ফসলের জমিকে অ-বীজ ফসলের জমি থেকে বা অ-বীজ ফসলের এলাকা থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখার নামই পৃথকীকরণ। কৃষক মানসম্মত বীজ রাখতে চাইলে একটু ব্যতিক্রম হিসেবে বীজ ফসলের চারদিকে বর্ডার লাইন হিসেবে একই ফসলের অতিরিক্ত চাষ করলে ভালো হয়। এতে পর-পরাগায়নের সম্ভবনা থাকে না;

৩. **বীজ শোধন:** বীজ জীবানু বহন করতে পারে। সেজন্য বীজ বপনের আগেই শোধন করে নিতে হয়। এবিষয়ে প্রাকৃতিকভাবে বীজ শোধন অংশে বিস্তারিত বর্ণণা করা হয়েছে;

৪. **বীজ বপন:** সবসময় বীজ সময়মতো বপন করতে হয়। আর বীজ বপনের সময় জমিতে জো থাকতে হবে সাধারণত বীজ ফসল নির্দিষ্ট দুরত্বে লাইনে বপন বা রোপন করা ভালো;

৫. **রগিং:** বীজের জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার জন্য রগিং একটি জুরুরী কাজ। রগিং হচ্ছে-বীজ ফসলের গাছ ছাড়া অন্যসকল গাছ ফুল আসার আগেই বীজ ফসলের এলাকা হতে শিকড়সহ অপসারন করা;

৬. **বীজ ফসলের আন্তঃপরিচর্যা:** এ পর্যায়ে বীজের জমি হতে অ-চাষকৃত উদ্ভিদ অপসারণ করা, যথাসময়ে রোগ-বালাই ও কীট-পতঙ্গ নিয়ন্ত্রেণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজন হলে পানি সেচ দেয়া;

৭. **বীজ ফসল কর্তন বা উত্তোলণ:** একটা জমির যখন বীজ ৮০-৯০ পরিপক্ক হয় ও বৃষ্টিবাদলে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীন থাকে তখনই বীজ ফসল কর্তন করতে হবে এবং তা ঝাড়াই-বাঁছাই করে বীজ রাখার ভান্ড যেমন- মাটির মঠকা, টিনের কৌটা বা অন্যকোন ধাতব জারে সংরক্ষণ করতে হবে;

৮. তিনটি উপায়ে বীজ উৎপাদন করা হয়। যেমন: মৌল বীজ, ভিত্তি বীজ এবং প্রত্যায়িত বীজ। আমাদের কৃষকগণ কারও সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যদি সেই সংস্থার নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ বীজ উৎপাদন করে তাহলে সেই বীজ প্রত্যায়িত বীজ হিসেবে পরিচিত লাভ করবে। প্রত্যায়িত বীজ সংগ্রহই কৃষকের জন্য ভালো।

৮.১.গ. আঞ্চলিক বীজ সংগ্রহ

এলাকা ভিত্তিক কিছু বীজ আছে যা ঐ এলাকাতেই ভালো হয়, সে জন্য অঞ্চলভিত্তিক বীজ সংগ্রহ করে সেগুলো উক্ত অঞ্চলে চাষাবাদ করতে হবে। যেমন- হাটহাজারী এবং সীতাকুন্ডের সীম, গফরগাঁও এবং ইসলামপুরী বেগুন, নরসিংদীর অমৃত সাগর কলা ও কাকরোল, আক্কেলপুরের পটল, পাহাড়ী বিভিন্ন প্রকার কচু ও আদা-হলুদ, বগুড়ার মরিচ ও লাল আলু ইত্যাদি।

৮.১.ঘ. অপ্রচলিত ফসলের বীজ সংগ্রহ

এখনও বাংলাদেশে এমন কিছু অপ্রচলিত ফসল বা ফল আছে যা অবহেলা ও অযত্নে বেড়ে উঠে এবং এগুলি খুব বেশি বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ না করা হলেও এগুলি বিশেষভাবে মর্যাদার সাথে বাজার দখল রাখে। তাই সেগুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে। যেমন: সজিনা ডাটা, স্থানীয় কাঁচা কলা বা আনাজ কলা, দেশী পেঁপে, বিভিন্ন প্রকার ইক্ষু, ওল কচু, মান কচু, গাছ আলু, মিষ্টি আলু, শিমলা আলু, ধুন্দল, নটেকাঁটা শাক, খুড়েকাঁটা শাক, হেলেঞ্চা শাক, কলমী শাক, বথুয়া শাক, নোনতা শাক, ব্রাম্মীশাক, থানকুনি ইত্যাদি হরেকরকম ফসল ও শাক এবং ফলের মধ্যে মিষ্টি লাল জাম্বুরা, সফেদা, চালতা, দেশী বড়ই, ডাব/নারিকেল, কাঁঠাল ইত্যাদি। যা হয়তো এখনও আমরা হাতের নাগালে পাচ্ছি কিন্তু অবহেলার কারনে ও আগ্রাসী বীজ কোম্পানিদের আগ্রাসনে এগুলিও হারিয়ে যেতে পারে। তাই এসব বীজ আমাদের সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৮.১.ঙ. উচ্চমূল্যের ধান বীজ ও অন্যান্য উচ্চমূল্যের শস্য বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

আমাদের দেশে এখনও অঞ্চলভেদে কিছু উচ্চমূল্যের ধান বীজ ও অন্যান্য শস্য বীজ আছে যা আমরা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ না করলে হয়তো সেসব একদা হারিয়ে যেতে পারে। তাই

সে সকল বীজ আমাদেরকেই স্থানীয়ভাবে সংরক্ষণ করার পাশাপাশি সম্প্রসারণেরও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যেমন দিনাজপুরের সুগন্ধী কাঁটারীভোগ ধান ও বাদশাভোগ ধান, শেরপুরের তুলসীমালা, খুলনার রানীপছন্দ, বরিশালের বালাম, বৃহত্তর ফরিদপুরের লক্ষীদীঘা, নেত্রকোনার বিরুই, বৃহত্তর টাংগাইলের চামারা, যমুনা পাড়ের গাঙ্গিয়া ইত্যাদি এখনও উচ্চমূল্যের ধান বীজ হিসেবে বহাল আছে তবে তাদের আবাসস্থল ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে। অপরদিকে বগুড়ার হাগড়াই আলু ও লাল আলু, ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের কাঁঠালী বেগুন, চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের বারমাসি মরিচ ও কাঁটা বেগুন, পঞ্চগড়ের ভক্তমান কলা, উপকুলীয় অঞ্চলের কাঁঠালী কলা, পাহাড়ী অঞ্চলের সূর্য্যপুরী বা অগ্নিশ্বর কলা। দানা জাতীয় আরও ফসলের মধ্যে- যমুনার পাড়ের বিভিন্ন প্রকার জব, কাউন, উত্তরাঞ্চলের ঢেঁমশী বা বাকুইট, কুলথি কালাই, মারুয়া বা রাগী ইত্যাদি আজ কালের বিবর্তনে সব হারিয়ে যাচ্ছে। এসবের মধ্যে অনেক কিছুই আজ বিশ্বে উচ্চমুল্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং মার্কেটে একটা শক্ত স্থান দখল করেছে যেমন- ঢেঁমশি বা বাকুইট ইউরোপে বেশ উচ্চমূল্যের কার্বোহাইড্রেট। তাই এগুলোকে বিশেষ মর্যাদার সহিত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে।

আচ্ছাদন পদ্ধতিতে আলু চাষ ও ফাঁদ ফসলের ব্যবহার

৮.২ ফসল ফলানোর জন্য প্রাকৃতিক উপায়ে বীজ শোধন

আমরা জেনে হোক আর না জেনে হোক খুব সাধারণভাবে যেকোন বীজ বপনের আগে রৌদ্রে শুকাতে দিই এবং তা কেন দিই সেটি জানবো- প্রত্যেকটি বীজ সুপ্তাবস্থায় থাকে এই বীজকে জাগ্রত করার জন্য প্রথমে বীজ রৌদ্রে দেয়া হয়। বীজের আকার ও গঠন এবং প্রকারভেদে ২০ মিনিট থেকে ৬০ মিনিট পর্যন্ত রোদে শুকাতে হয়, ছোট এবং অপেক্ষাকৃত হালকা বীজগুলি ২০-৩০ মিনিট এবং মোটা ও বড় বীজগুলি ৫০-৬০ মিনিট রোদে শুকাতে

হয়। অতঃপর বীজগুলির ৮০% থেকে ৯৫% অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বাড়ানো ও বীজের মধ্যে লুকায়িত ক্ষতিকর ভাইরাসগুলি নষ্ট করার জন্য রৌদ্রে শুকানো বীজগুলি কমপক্ষে ১ঘন্টা ছায়ায় রাখতে হবে। অতঃপর নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে আমরা জৈবিকভাবে বীজ শোধন করবো।

বীজের সুপ্তাবস্থা জাগানোর জন্য বীজ রৌদ্রে শুকানো হচ্ছে

ক) আমরা জানি সাধারণত পানি ১০৪ ডিগ্রী সেঃ তাপমাত্রায় ফুঁটে তাই বীজের পরিমাণ ভেদে প্রয়োজন মতো ফুটন্ত গরম পানি চুলা থেকে নামিয়ে উক্ত পানির সাথে টিউবওয়েলের ফ্রেশ ও নরমাল পানি সমপরিমাণ মিশিয়ে ৫ মিনিট অপেক্ষা করবো। এতে করে উক্ত পানির তাপমাত্রা ৫০-৬০ ডিগ্রী সেঃ তাপমাত্রায় নেমে আসবে। এই পানিতে ২০-৩০ মিনিট বীজ ভিজিয়ে রেখে পানি ছেঁকে নিবো এবং বীজগুলি একটা সুতি নেকড়ায় বেঁধে ১২-২৪ ঘন্টা ছায়াযুক্ত স্থানে ঝুলিয়ে রাখবো। এই প্রক্রিয়ায় বীজবাহিত ভাইরাসগুলি মারা যায় ও বীজ শোধন হয়ে যায় এবং বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা অনেকগুন বেড়ে যায়। প্রকারভেদে বিভিন্ন ধাপে বীজকে অঙ্কুরিত করার জন্য বিভিন্ন উষ্ণ জায়গায় বীজকে রেখে দিতে হয়।

খ) দেশী গাভীর (গাভীন) মূত্র দিয়ে এবং বায়োডার্মা ভিরিডি পাউডার দিয়ে বীজ শোধন করা যায়। পরিমিতভাবে উক্ত উপাদান গুলিতে প্রয়োজনীয় বীজ ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রেখে পানি ঝড়িয়ে সুতি কাপড়ে বেঁধে ২৪-৪৮ ঘন্টা ছায়াযুক্ত স্থানে ঝুলিয়ে রাখুন। বেশিরভাগ বীজ অঙ্কুরিত হলে মাটিতে বীজ বপন করুন।

গ) ১% পটাশ মিশ্রিত (পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট) দ্রবণে ১০ থেকে ২০ মিনিট বীজ ভিজিয়ে রাখলে বীজ শোধন হয়।

ঘ) ধানের বীজ শোধনে ১০ লিটার পানিতে ১৫০০ গ্রাম লবন ভালোভাবে গুলিয়ে নিয়ে তাতে ৫ কেজি ধানের বীজ কিছুক্ষণ নাড়া করলে চিটে ধান বা পাতান ধান গুলি ভেসে উঠবে। চিটে গুলি আলাদা করে বীজ ধান পরিস্কার পানিতে ধুয়ে নিয়ে দেশীয় গাভীর গো-চনা এবং পরিস্কার পানি ১ঃ১ অনুপাতের দ্রবণে এক রাত ভিজিয়ে রেখে জাঁক দিলে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং বীজের ভিতর ভাইরাস বাহিত রোগ প্রতিহত করা যায়। সবজি ও অন্যান্য দানাদার শস্য বীজের ক্ষেত্রে দেশীয় গাভীর গো-চনা এবং পরিস্কার পানি ১ঃ১ অনুপাতের দ্রবণে ভিজিয়ে রেখে সুতি নেকড়ায় ৬-১২ ঘন্টা টাঙ্গিয়ে রেখে জাঁক দিতে হবে। সূত্রঃ কৃষকদের প্রচলিত জ্ঞান চর্চা

ঙ) ভারতের বিখ্যাত প্রাকৃতিক কৃষি গবেষক সুভাষ পালেকারের উদ্ভাবিত বীজামৃত দিয়েও বীজ শোধন করা যায়। বীজামৃত বানানোর নিয়মঃ

১০০ কেজি বীজ শোধনের জন্য বীজামৃত তৈরি করতে হলে আমাদের নিম্নোক্ত উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে।

(১) ৫০ লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন একটি খালি ড্রাম

(২) ২০ লিটার পানি

(৩) দেশী গাভীর গো-চনা ৫ লিটার

(৪) দেশী গাভীর টাটকা গোবর ৫ কেজি

(৫) ৫০ গ্রাম পান খাওয়ার চুন

থালি ড্রামে গরুর গোবর ও গো-চনা নিয়ে তাতে দ্বিগুন পানি মিশাতে হবে। সমস্ত দ্রবণটি ভালোভাবে একসাথে মিশিয়ে নিতে হবে। অতঃপর ৫০ গ্রাম সাদা চুন ২৫০ মিলি পানির সাথে গুলিয়ে আগের দ্রবনের সাথে মিশ্রিত করতে হবে। মিশ্রণটি পাটের বস্তা বা সুতি কাপড় দিয়ে ভালোাভাবে এক রাত ঢেঁকে রাখতে হবে। সকালে পুনরায় দ্রবণটি ভালোবাবে নেড়ে নিলে তা বীজ শোধনের জন্য উপযুক্ত হবে। দ্রবণটি একটি কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে ব্যবহার করা যাবে। বীজের পরিমাণ কম হলে আনুপাতিক হারে দ্রবণটি তৈরি করে ব্যবহার করতে হবে।

এই দ্রবণটি ব্যবহারের কৌশলঃ

আমরা জানি উদ্ভিদের মধ্যে সাধারণত এক বীজ পত্রী উদ্ভিদ ও দ্বি-বীজ পত্রী উদ্ভিদ আছে অতএব সে বিচারে ফসলের বীজকে ২ভাগে ভাগ করা হয়। যেমনঃ মনোকট বা এক বীজ পত্রী উদ্ভিদ বীজগুলিতে (পেঁয়াজ,রসুন, ধান,গম, মরিচ, বেগুন ইত্যাদি) জীবামৃত মিশিয়ে বীজের গা ছায়ায় শুকিয়ে নিয়ে বপন করা যেতে পারে। আর ডাইকট বা দ্বি-বীজ পত্রী উদ্ভিদ বীজগুলি একটি পাত্রে নিয়ে তাতে বীজামৃত ঢেলে একটা কাঠি দিয়ে নেড়ে নিন। অতঃপর বীজগুলি ছায়ায় শুকাতে দিন। বীজের গা শুকালে তা বপন করুন।

কাটিং করা বীজ যেমন- আখ, আলু, পটলের কাটিং ইত্যাদি বীজামৃত দিয়ে ভিজিয়ে নিন এবং ছায়ায় তা শুকাতে দিন অতঃপর মাটিতে বপন করুন। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার কাটিং-এ ছাই ব্যবহার করা যেতে পারে এবং বোর্দো মিক্সারও বেশ কার্যকরী।

উপরোক্ত সবগুলি পদ্ধতির যে কোন একটা অনুসরণ করলে বীজের ভিতরের ভাইরাস মরে যায় এবং বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বহুগুনে বেড়ে যায়।

৮.৩ পরিবেশবান্ধব উপায়ে পরিকল্পিত বীজ বপন প্রক্রিয়া

বীজ শোধনের পর আমরা বীজ বপনে যাবো-সাধারণভাবে যে কোন বীজ বপনের জন্য মাটি তৈরি বড় একটা বিষয়। তাই আগে মাটি ঝুর-ঝুরে করে তৈরি করতে হবে এবং মাটিতে খুব বেশি রস বা স্যাঁতসেঁতে ভাব থাকা যাবে না। বেশি রস থাকলে বীজ পঁচে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার মাটি খুব বেশি শুস্ক হওয়া যাবে না তাতে করে বীজ পানি অভাবে অঙ্কুরোদগম করতে পারবে না।

বীজ বপনে করণীয়ঃ

ক) জৈবিকভাবে শোধনকৃত বীজ যেগুলি প্রথমে ভিজাতে হয় (যে বীজগুলি ভিজানো প্রয়োজন)। আকার ও প্রকারভেদে ১৫ থেকে ৩০ মিনিট পানিতে ভিজিয়ে রেখে তারপর উঠাতে হয় (কিছু অধিক পুরুত্বের বীজ ১২ ঘন্টা পর্যন্ত ভেজাতে হয়) এবং সুতি কাপড় বা নেকড়ায় সেটি কমপক্ষে ১২-২৪ ঘন্টা ছায়াযুক্ত স্থানে টাঙ্গিয়ে রাখতে হয়। অতঃপর ছায়ায় বীজ শুকিয়ে নিতে হবে এবং বিকাল বেলায় বপন করতে হবে।

খ) সঠিক সময়ে সঠিক বীজ বপন করতে হয়। অর্থাৎ অসময়ে ভালো বীজ বপন করলেও কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া যায় না। আরেকটা বিষয় অবশ্যই লক্ষনীয়- যে বীজের পুরুত্ব যত সেঃমিঃ ঠিক তত সেঃমিঃ মাটির গভীরে বীজ দেয়া জরুরী, তাতে করে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ৮০%- থেকে ৯৫% হয়। আর কুমড়া জাতীয় ফসলের বীজগুলিকে লম্বা-লম্বি বা চিৎ করে না দিয়ে কাত করে দিলে অঙ্কুরোদগম ভালো হয়।

গ) যে সকল সবজির চারা করতে হয় সেসকল বীজের জন্য অবশ্যই বেড পদ্ধতিতে চারা করতে হবে এবং ঐসব বেড স্লোরাইজেশন করে তাতে পর্যাপ্ত পঁচা গোবর ও কিছু চুলার ছাই ব্যবহার করে উক্ত বেডে বীজ দিতে হবে।

ঘ) যে সকল বীজের অঙ্কুরোদগম কম হয় সেসকল বীজ পানি থেকে উঠিয়ে পানি ঝড়িয়ে কিচেন টিস্যু পেপারে স্তরে স্তরে সাজিয়ে একটা এয়ার টাইট বক্সে ৪৮-৭২ ঘন্টা রাখলে বীজের মুখ ফাঁটে। ঐ রকম অবস্থায় বীজ সীড বেডে দিলে চারা তাড়াতাড়ি অঙ্কুরিত হয়।

৮.৪. চন্দ্র ক্ষণ জেনে বীজ বপন

ভরা অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার তিতিক্ষণে জমিতে বা মাটিতে বীজ দেয়া যাবে না, এতে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং বীজ নষ্ট হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

৮.৫. আবহাওয়ার পূর্বাভাস জেনে বীজ বপন ও চারা রোপন

গুগলের মাধ্যমে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জেনে জমিতে বীজ ও ফসল বপন করতে হবে, বৃষ্টির সম্ভবনা থাকলে জমিতে বীজ না দেয়াই উত্তম।

৮.৬. বীজ বপন বা শস্য বুননে প্রয়োজনীয় টিপস

১. মৌসুমের ফসল মৌসুমেই চাষ করলে বীজের অঙ্কুরোদগম বেশি হয়; (লালনের গানের কলি অসময়ে কৃষি করে মিছামিছি খেটে মরে গাছ যদিও হয় বীজের জোড়ে ফল তাতে হবে না)

২. কৃষ্ণ পক্ষের চাইতে শুক্লা পক্ষে বীজ বপন করলে তুলনামূলকভাবে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। কারণ মাটিতে এসময়ে বেশিরভাগ জো থাকে ;

৩. সকল শস্য বীজকে যদি দেশীয় গাভীন গাভীর মূত্রে চুবিয়ে নিয়ে বপন করা হয় তবে ভালো বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ১০০% বেড়ে যায়। এ জন্য গাভীর মূত্রে বীজগুলি কমপক্ষে ২০-৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হবে;

৪. সকল শস্য বীজগুলি জীবামৃত প্রোবায়োটিকস দ্বারা দ্রবীভূত করলে বীজের অঙ্কুরোদগম বেশি হয়;

৫. ছোট দানার বীজের সাথে সবসময় ঝুরঝুরে মাটি/ বালি বা ছাই মিশিয়ে ছিটালে

জমিতে বীজের পরিমাণ সমহারে বুনন হয়। যেমন- লালশাকের বীজ, ডাটা বীজ, কালোজিরা বীজ ইত্যাদি ছোট বীজ;

৬. কিছু বীজ আছে শত্রু প্রাণির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবং অঙ্কুরোদগম বাড়ানোর জন্য বীজ বল তৈরি করে সেগুলো বপন করা যেতে পারে।

সাবধানতা: প্রত্যেক সবজি বা ফসলের জন্য পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা জরুরী তাই বীজ বপনের পরে যাতে মাটিতে পানি জমে না থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

সবজি বীজ বপন

৯ম পাঠ

পরিবেশবান্ধব শস্য চাষাবাদ পদ্ধতি বা পদসোপান

রাসায়নিক কৃষি প্রচলনের আগ পর্যন্ত প্রায় ১০ হাজার বছর ধরে যে কৃষি ব্যবস্থা সমগ্র পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিলো সেটা ছিলো সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি নির্ভর এবং পরিবেশবান্ধব। এখানে মনুষ্য পরিশ্রম খুব বেশি করতে হতোনা শুধুমাত্র তাদের চাহিদা মোতাবেক শস্যবিন্যাস করে ফসল ফলাতো এবং আহোরণ করতো। যা কোন বিকল্প পদ্ধতি ছিলোনা বরং সেটাই ছিলো মুলধারা। এখনকার কৃষির মত রাসায়নিক নির্ভর, হাইব্রীড বীজ ও যন্ত্র নির্ভর কৃষি ব্যবস্থা তৎকালীন সময়ে ছিলোনা জন্য তখন কৃষক ছিলো সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্ত।

পরিবেশবান্ধব কৃষি কৃষককে দখলদার রাসায়নিক কোম্পানির রাহু থেকে বাঁচতে সাহায্য করবে, কেননা এই ব্যবস্থায় কৃষক তার কৃষিতে প্রয়োজনীয় সকল যোগান নিজেই দিতে সক্ষম হবেন।

নীচের সারণিতে রাসায়নিক কৃষি ও পরিবেশবান্ধব কৃষির পার্থক্য তুলে ধরা হলোঃ

ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং বা পরিবেশবান্ধব কৃষি	রাসায়নিক কৃষি
স্থানীয় ও প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার হয় জন্য কৃষক থাকে স্বাধীন	রাসায়নিক সার ও আমদানীকৃত উপদান ব্যবহার করা হয় জন্য কৃষক থাকে পরাধীন
পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে	পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়
মাটিতে উপকারী জীব-অনুজীবের আবাসস্থল সুসংহত হয় এবং মাটির উর্বরতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়।	মাটিতে উপকারী জীব-অনুজীবের আবাসস্থল ধ্বংস হয় এবং মাটির উর্বরতা হ্রাস পায়
মাটির পানি ধারন ক্ষমতা বাড়ে	মাটির পানি ধারন ক্ষমতা কমে যায়
মাটির প্রয়োজনীয় উপাদান বজায় থাকে	মাটির প্রয়োজনীয় উপাদান ক্রমশঃ কমতে থাকে
খাদ্যের গুনগত মান বজায় থাকে	খাদ্যের গুনগত মান বজায় থাকে না
জৈবিক উপায়ে উৎপাদিত খাদ্য তুলনামুলকভাবে বেশি সুস্বাদু হয়	রাসায়নিক উপায়ে উৎপাদিত খাদ্য সুস্বাদু কম হয়
ফসলের রোগ ও পোকা- মাকড়ের আক্রমণ কম হয়	ফসলের রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ তুলনামুলকভাবে বেশি হয়
জৈবিক উপায়ে উৎপাদিত ফসলের চাহিদা বেশি	রাসায়নিক উপায়ে উৎপাদিত ফসলের চাহিদা তুলনামুলকভাবে কম
শস্যবৈচিত্র্য রক্ষা করে	শস্যবৈচিত্র্য নষ্ট হয়
মৎস্য সম্পদ,পশু সম্পদ ও পাখি সম্পদ রক্ষা করে	মৎস্য সম্পদ,পশু সম্পদ ও পাখি সম্পদ হ্রাস পেতে থাকে
ফসলের স্থানীয় জাতগুলো হারানোর হাত থেকে রক্ষা পায়	ফসলের স্থানীয় জাতগুলো হারিয়ে যায়
মানুষের স্বাস্থ্যের উপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে না	মানুষের মারাত্মক স্বাস্থ্যহানি ঘটে
চাষাবাদ ক্রমশঃ ব্যয় সাশ্রয় হয়	চাষাবাদ ক্রমশঃ ব্যয়বহুল হয়ে উঠে

ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং বা পরিবেশবান্ধব কৃষি যথাযথভাবে করতে গেলে অবশ্যই তা পদসোপানভিত্তিক করা জরুরী। তা নাহলে এই ব্যবস্থাকে সুস্থায়ি করা যাবে না। আর পরিবেশবান্ধব কৃষিতে সুস্থায়ি ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তা কখনও ধরে রাখা সম্ভব হবে না। পরিবেশবান্ধব কৃষির পদসোপান পালন করতে হলে আমাদেরকে নিম্নোক্ত ধাপগুলি অনুসরণ করতে হবে।

ক. পরিবেশবান্ধব উপায়ে মাটি শোধন ও জমি প্রস্তুতকরণ
খ. প্রাকৃতিকভাবে তৈরিকৃত বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
গ. শস্যবৈচিত্র্যকরণ
ঘ. শস্য পর্যায় অবলম্বন
ঙ. স্তরভিত্তিক শস্য চাষাবাদ (Multi Layer Cropping)
চ. পালা চাষ বা Relay Cropping
ছ. পয়রা বা উতেরা চাষ
জ. শস্য বহুমুখীকরণ বা মিশ্রচাষ (Multiple Cropping-MC)
ঝ. সুসমন্বিত চাষব্যবস্থা (Integrated Farming Syestem)
ঞ. আচ্ছাদন বা কভারক্রপ চাষাবাদ
ট. অ-কৃষি সঙ্গী উদ্ভিদের রক্ষনা-বেক্ষণ
ঠ. অতিরিক্ত অ-শস্য উদ্ভিদ বা ঘাস নিবারণ

৯.১.ক. ইকোলোজিক্যাল বা পরিবেশবান্ধব উপায়ে মাটি শোধন ও জমি প্রস্তুতকরণ

পরিবশবান্ধব উপায়ে মাটি শোধন ও জমি প্রস্তুতকরণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরিবেশবান্ধব মাটি তৈরি ও মাটি উন্নতকরণ অংশে বিষদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তথাপি আমাদের সমতল ভূমিতে সবজি সব চাইতে বেশি জন্মে বিধায় সমতল নিয়ে আরও কিছু আলোচনা করা হলো-

সমতল ভূমিতে চাষাবাদের জন্য জমি প্রস্তুত করা হয় প্রধানত রবি মৌসুমকে টার্গেট করে। এই মৌসুমে জমি প্রস্তুত বেশি করা হয় জন্য আমাদের দেশের ক্ষুদ্র চাষীদের গরু বা বলদের হাল থাকা দরকার। কেননা গরুর হাল দিয়ে জমি চাষ করলে জমি কয়েকদিনে বিভিন্ন ধাপে চাষ ও মই দেয়া যায়, এতে করে জমি ভালোভাবে প্রস্তুত করা যায় এবং জমির অসঙ্গী ফসল (আগাছা) স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণে থাকে। আর পাওয়ার ট্রিলার বা রোটাভেটর দিয়ে জমি চাষ দিলে সে জমি খুব অল্প সময়ে তৈরি করা হয়। এতে করে জমিতে থাকা ঘাস বা অসঙ্গী উদ্ভিদ (আগাছা) লক্ষ লক্ষ টুকরো হয়ে যায়, যা সাধারণত বাঁছাই করার সুযোগ থাকে না ফলে প্রধান ফসলের চেয়ে জমিতে ঘাসের আবাদ বেশি হয়ে যায়। তখন এই সব ঘাস নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়না বিধায় পুঁজিবাদি মুনাফালোভী কোম্পানিগুলো প্রকৃতির উদ্ভিদকে আগাছা নাম দিয়ে তা ধ্বংসের জন্য অসৎ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কৃষকের কাছে আগাছানাশক বিক্রী করে।

এজন্য জমি তৈরি করতে হলে বছরব্যাপী পরিকল্পনা করে জমি গরুর হাল দিয়ে বিভিন্ন ধাপে চষতে হবে এবং মই দিতে হবে। কারও গরুর হাল না থাকলে সেক্ষেত্রে যদি পাওয়ার ট্রিলার দিয়ে জমি চাষতে হয় তবে একই দিনে সম্পূর্ণ জমি তৈরি না করে কমপক্ষে ৩ দিন পর পর ৩ বার চাষ ও মই দিয়ে জমি প্রস্তুত করুন এবং অতিরিক্ত ঘাস বাঁছাই করে জমি পরিস্কার করুন। বিভিন্ন ধাপে ধীরে-সুস্থে জমি তৈরি করলে জমিতে প্রচুর আলো-বাতাসের প্রবাহ বাড়বে এবং উপকারি জীবাণু জন্মানোর পরিবেশ তৈরি হবে। জমি বছরে একবার তৈরি করে সেই জমিতে সারাবছর ফসল ফলাতে হবে। অর্থাৎ ফসল বিন্যাস এমনভাবে করুন যাতে করে বছরব্যাপি ৩-৪টা প্রধান ফসল করা যায় এবং এইসব প্রধান ফসলের জন্য পরবর্তীতে জমি আর চাষ না করতে হয়।

একবার চাষে বিভিন্ন প্রকার প্রধান ফসল

৯.১.খ. প্রাকৃতিকভাবে তৈরিকৃত বীজ সংগ্রহ

পরিবেশবান্ধব কৃষিতে ফসলের বীজ একটা বড় নির্ণায়ক এবং ঝুঁকিপূর্ণ অংশ। তাই কোম্পানির বীজ থেকে দূরে থাকতে হবে। কারন বহুজাতিক কোম্পানির বীজ মানে বিদেশী সংকর বীজ, জিন প্রযুক্তির অগ্রহণযোগ্য বীজ। এক্ষেত্রে অবশ্যই দেশী বীজ ব্যবহার করা উত্তম, দেশীয় ও আঞ্চলিক বীজ রোগসহনশীল এবং জলবায়ুসহিষ্ণু। আরেকটা কারণ হলো যে বীজ কৃষক নিজেরা উৎপাদন করতে পারবে সে বীজ ব্যবহার করাই জরুরী, কারন তাতে বীজের উপর কৃষকের অধিকার বজায় থাকবে এবং বাজার থেকে বীজ কিনতে হবে না।

৯.১.গ. শস্যবৈচিত্র্যকরণ

ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং এ জীববৈচিত্র্য সম্ভার সমৃদ্ধ করবার জন্য শস্যের প্রজাতি সংখ্যা যথাসম্ভব বেশি রাখতে হবে। নানা প্রজাতির শস্য একসঙ্গে একই জমিতে চাষ, পর্যায়ক্রমে একের পর এক বিভিন্ন প্রজাতির শস্যের চাষ, বিভিন্ন মৌসুমে একই প্রজাতির নানা প্রকার শস্যের চক্রাবর্তী চাষ ও তার সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার শস্যের সঙ্গ বদল এবং প্রতিটি শস্যের

বিভিন্ন জাতের চাষ ইত্যাদি শস্যবৈচিত্র্য বাড়িয়ে তোলে। শস্যের বৈচিত্র্যের পাশাপাশি অ-কৃষি উদ্ভিদের বৈচিত্র্যও যথাসম্ভব বেশি রাখা উচিত।

উত্তর আমেরিকার আদিবাসি কৃষকরা প্রায় ১৫০০ বছর আগে শস্যবৈচিত্র্য বাড়ানোর জন্য একই গর্তে ভুট্টা, মিষ্টিকুমড়া/স্কোয়াস ও বীন বা বরবটির বীজ লাগিয়ে ভালো রেজাল্ট পেয়েছিলেন। এই পদ্ধতিকে তিন বোন বা থ্রী সিষ্টার চাষ বলা হয়। যা পরবর্তী পর্যায়ে শস্যবৈচিত্র্য বাড়ানোর জন্য এখনও মডেল হিসেবে কাজ করছে। থ্রী সিষ্টার পদ্ধতিতে ভুট্টার গাছ বেয়ে বীন বা বরবটির লতা উঠে যায়, আর মিষ্টিকুমড়ার লতা মাটিতে লতিয়ে অতিরিক্ত ঘাসের সংখ্যা কমিয়ে দেয়। "ভুট্টা" বরবটির অবলম্বন লাঠি হিসেবে কাজ করে, মিষ্টিকুমড়ার বড় বড় পাতা মাটিতে আচ্ছাদন তৈরি করে মাটির আদ্রতা বজায় রাখে। আবার বীনের শিকড়ের অর্বুদ নাট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণুর অর্বুদ তিনটি শস্যকেই নাইট্রোজেনের যোগান দেয়।

থ্রী সিষ্টার বা তিন বোন ফসল

আমাদের দেশে উত্তরাঞ্চলে এখনও অনেক কৃষক একই জমিতে ৫ রকমের ফসল ফলিয়ে শস্যবৈচিত্র্য বজায় রাখে। প্রধান ফসল আলু লাগালে সেই জমিতে প্রতি ৫ সারি পর পর এক সারিতে পটলের ডগা রোপন করে, আবার ঐ পটলের লাইনেই পেঁয়াজ, রসুন লাগায় এবং জমির আইলের ধার দিয়ে সরিষা বা তিষি অথবা ধনিয়া বপন করে। আবার আলু ৯০ দিনের মধ্যে উঠে গেলে তখন ২য় প্রধান ফসল হয় পটল আর এই পটলের জমিতে কৃষকগণ ফাল্গুনের শুরুতে কিছু পুঁইশাক, পাটশাক ও মরিচ রোপন করে। পুঁইশাক ও পাটশাক খুব স্বল্প সময়ে উঠে গেলে তাতে আবার চৈত্র্য-বৈশাখ মাসে আদা ও হলুদ লাগিয়ে দেয় এবং জমির আইলে কিছু পেঁপে গাছ রোপন করে।

উপরোক্ত পদ্ধতি কৃষকের জন্য ব্যয় সাশ্রয়ী একটি মডেল। তবে এক্ষেত্রে আরও শস্যবৈচিত্র্য বাড়ানো সম্ভব। যেমন- ধরা যাক আপনি রবি মৌসুমের শুরুতে জমিতে প্রধান ফসল হিসেবে আলু করবেন তাহলে ফসল বিন্যাস এমন হবে যাতে করে আপনার আলুর জমিতে সারাবছর আর চাষ দিতে না হয়। এজন্য খড় ও লতাপাতা দিয়ে মালচিং পদ্ধতিতে (বেশি পুরুত্ব করে) দেশীয় আলু করা যেতে পারে, এই আলুর মাঝে সারি করে পটলের ডগা/শিকড় বা চারা রোপন করুন। আলু উঠানোর পর মালচিং-এর যে অবশিষ্ট থাকবে তাতে পটল আবাদ হবে। পটলের লাইনে ফাঁকা জায়গায় পেঁয়াজ-রসুন দিতে হবে। আর আলু লাগানোর সময় সমগ্র জমিতে কিছুটা দেশীয় ধনিয়া, সরিষা, মুলা, শালগম, ওলকপি, গাজর, বীট, টমেটো, দেশী ভুট্টা,পালংশাক, বাবুরীশাক ও রাঙ্কুনীপাতা ইত্যাদির বীজ ছিটিয়ে দিন এবং আইলের ধার দিয়ে আইল ফসল হিসেবে তিষি অথবা কালোজিরা বুনে দিন। এসব সঙ্গী ফসল আবাদ করলে একটা কৃষক পরিবার তাদের চাহিদা মিটিয়ে বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি করতে পারবে। এখানে লক্ষ করলে দেখা যাবে পুরো জমিটি পরিবেশবান্ধব কৃষির সকল উপাদান নিয়ে সেঁজে উঠেছে। এখানে আচ্ছাদন দিয়ে প্রধান ফসল করার পাশাপাশি শস্যবৈচিত্র্য থেকে শুরু করে শস্যপর্যায়,শস্য বহুমুখীকরন, পোকা বিতাড়ক বিতৃষ্ণা, ফাঁদ ফসল, নেমাটোড প্রতিরোধী ফসল, আইল ফসল, অবলম্বন ফসলসহ (ভুট্টা) সবকিছুই বিদ্যমান। আলু উঠানোর পর পটল হয়ে যাবে প্রধান ফসল,তাই পটলের জমির মাঝে-মাঝে বৈশাখ মাসে আদা এবং হলুদ ও মরিচ গাছ দিয়ে দিতে হবে। আবার আইলের ধার দিয়ে ফাল্গুন মাসে কিছু পেঁপে গাছ ও ওলকচু লাগাতে হবে। এভাবে বছরের প্রথমে একবার জমি চাষ দিয়ে সারাবছর বিনা চাষে অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ ফসল পাওয়া সম্ভব।

উপরোক্ত পদ্ধতি শুধুমাত্র ইকোলোজিক্যাল চাষাবাদকেই সমৃদ্ধ করবেনা বরং একজন চাষীকে বিভিন্ন ব্যয়ের খাত থেকে ব্যয় সাশ্রয় করে লাভবান করবে।

ব্যয় সাশ্রয়ের খাতসমূহ

- ✓ জমি চাষ: একই জমিতে বছরে তিনটি প্রধান ফসল ফলালে ২ বার চাষের ব্যয়হ্রাস পাবে;
- ✓ ঘাস নিড়ানি: আচ্ছাদন পদ্ধতি ও শস্যবৈচিত্র্যকরণে নিড়ানি ও আগাছানাশকের ব্যয়হ্রাস হবে;
- ✓ পোকা বিতাড়ক ও ফাঁদ ফসল এবং অবলম্বন ফসল থাকায় কীটদমনের ব্যয়হ্রাস পাবে;
- ✓ জমিতে আচ্ছাদন থাকায় সেচের ব্যয়হ্রাস।

শস্য বৈচিত্রকরণ

উপরোক্ত পদ্ধতির ন্যায় একই জমিতে নেমাটোড প্রতিরোধি ধনিয়া, পোকা বিতাড়ক শস্য কালোজিরা, তুলশী, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি বপন করলে যেমন শস্যবৈচিত্র্য বাড়ে তেমনি প্রতিটি উদ্ভিদ পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে একে অপরকে সাহায্য করে বেড়ে উঠে ও প্রকৃতির পরিবেশ বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

ফসল বৈচিত্র্যকরণে আমাদের কৃষকদের সংগঠিত হতে হবে এবং একই এলাকার সকলে মিলে আলাদা আলাদা শস্যবৈচিত্র্যকরণ পরিকল্পনা গ্রহণ করে ফসল ফলাতে হবে। আর এই পরিকল্পনা করার সময় স্থানীয় বাজার ও দেশীয় বাজারের উপর নজর রাখতে হবে এবং আগে যা প্রচলিত ছিলো এখন তা অপ্রচলিত ফসল হয়ে গেছে সেইসব ফসলের শস্যবৈচিত্র্য বাড়াতে হবে। যেমন-

বাক হুইট বা ঢেমশি, তিষি, সরিষা, তিল, কাউন, পায়রা/ যব/ বার্লি, জোয়ার, বাজরা, মখাই বা দেশী ভুট্টা, বিশেষ রঙের মিষ্টি আলু (এ্যান্থোসায়ানিন সমৃদ্ধ), ওলকচু ইত্যাদি চাষ নতুন করে সম্প্রসারণ করতে হবে। কারণ এগুলো এখন দামী ফসল ও উচ্চ পুষ্টিগুন সমৃদ্ধ ফসল এবং তুলনামূলকভাবে চাষের ব্যয়ও কম।

মিষ্টি আলু

৯.১.ঘ. শস্য পর্যায় অবলম্বন

বর্তমানে আধুনিক যান্ত্রিকীকরণ কৃষির পাশাপাশি ধীরে ধীরে নিবিড় চাষাবাদের দিকে মানুষ অনেকটা ধাবিত হচ্ছে। কৃষিকে যদি সঠিক পরিকল্পনামাফিক সঠিক বাণিজ্যকরণে না নেয়া হয় তবে চাষী চিরকাল বঞ্চিতই থেকে যাবে। তাই আমাদের দেশে আবহাওয়া ও জলবায়ু বিবেচনা করে একই জমিতে একই জাতের ফসল না করে বরং তা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানা জাতের ফসল চাষ করতে হবে। আর চক্রাকারে ফসলের এই চাষাবাদ পদ্ধতিকে শস্য পর্যায় বা শস্য চক্র বলে। যেমন- তণ্ডুল জাতীয় ফসলের পর ডাল জাতীয় ফসল তারপর সবজি চাষ করা তারপর পাট তারপর ফল ইত্যাদি। এখানে তণ্ডুল জাতীয় উদ্ভিদের শিকড় অগভীর, ডাল ও শিম জাতীয় ফসল নাইট্রোজেন দেয়, ধৈইঞ্চা, তিল, পাট ইত্যাদি ফসলের শিকড় মাটির গভীরে যায়, গ্রীষ্মকালের মুগ মাটিতে আচ্ছাদন ও নাইট্রোজেন প্রদানকারী হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া একই জমিতে পর পর ২-৩ বার দীর্ঘকালীন ফসল করা ঠিক নয় যেমন কলার পরে আখ চাষ করা উচিৎ নয় কিংবা আখের পর কলা অথবা ভুট্টা, কাকরোল ও পটল চাষাবাদ করা উচিৎ নয়। তবে একই বছরে একই জমিতে একই গোত্রের ফসল আবাদ না করে বিভিন্ন গোত্রের ফসল একসাথে চাষ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

তণ্ডুল (দানা) জাতীয় ফসল ⟷ ডাল বা শিম জাতীয় ফসল ⟷ পাতা বা সবজি জাতীয় ফসল ⟷ ধৈইঞ্চা বা পাট জাতীয় ফসল ⟷ ফল জাতীয় ফসল।

এই পদ্ধতিতে চাষ করলে জমির উর্বরতা বজায়, ভূমিক্ষয় রোধ এবং জমিতে জৈব পদার্থের মান ঠিক রেখে রোগ-ব্যধি নিয়ন্ত্রণ এবং জমির অ-শস্য উদ্ভিদ বা ঘাস দমন করা যায়।

৯.১.ঙ. স্তরভিত্তিক শস্য চাষাবাদ (Multi Layer Cropping)

একই সময়ে মাটির অভ্যন্তরীণ স্তর ও উপরিভাগের স্তর বিবেচনা করে এবং ফল-ফসলের খাদ্য ও সময় বিবেচনা এবং গাছের বিভিন্ন উচ্চতা ও মূলের বিভিন্ন দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বিভিন্ন ফল-ফসল একই জমিতে স্তরভিত্তিক ফলানো যায়। এই পদ্ধতিতে প্রধান ফসলের ফলন সবসময় বজায় থাকবে এবং অপ্রধান ফসলগুলির ফলন কিছুটা কম হবে। এতে করে জমির যেমন সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় তেমনি পোকা-মাকড় থেকে ফসলকে রক্ষা করা যায় ও শস্যবৈচিত্র্য নিশ্চিত করা যায়। যেমন-

লতা জাতীয় ফল বা গর্ত ফসল (Pit cropping) সেই গর্তে মুলা, বীট, ওলকচু এবং মাঁচার নীচে কলমী শাক, পুঁইশাক, আদা-হলুদ লাগানো যেতে পারে। তাছাড়া লতা জাতীয় ফসলের পত্রবিন্যাস ও আকার অনুয়ায়ী দ্বি-স্তর বা ত্রি-স্তর বিশিষ্ট মাঁচা করা যেতে পারে। যেমন সবথেকে নীচের মাঁচায় পুঁইশাক এবং তার উপরে ঝিংগে, চিচিংগা অথবা

লাউ দেয়া যেতে পারে এবং সর্বশেষ স্তরে করলা বা উস্তে করা যায়। অনুরূপভাবে একই জমিতে বিভিন্ন ফল ও ফসল একই সাথে চাষাবাদ করা যায়। যেমন- ১টা মাঁচা করলে মাঁচার উপর কুমড়ো জাতীয় ফসল, তার নীচে ঘাস, কলমীশাক, পুঁইশাক এবং আদা-হলুদ করা যায়, মাঝখানে কিছু ধৈইঞ্চা, মেস্তা ও ভুট্টা করলে তার সাথে কিছু সীম জাতীয় ফসল এবং তার উপরের স্তরে পেঁপে-কলা, তার উপরের স্তরে যদি অফলা জীবন্ত কোন খুঁটি গাছ থাকে তবে তাতে বিভিন্ন গাছ ফসল মৌ শিম, গাছ আলু ইত্যাদি দেয়া যেতে পারে।

চিচিঙ্গা ও পুঁইশাকের চাষাবাদ ছবি

৯.১.চ. পালা চাষ বা Relay Cropping

অধিক জনসংখ্যা ও আর্থ সামাজিক অবস্থা চিন্তা করে বহুফসল ব্যবস্থাপনায় কৃষক এখন বহু ফসল ফলাচ্ছে। অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই জমি ফেলে রাখার সুযোগ নেই। একসাথে বিভিন্ন মিশ্র ফসল চাষের পরেও একক প্রধান ফসল ধরে ধরে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ফসল করা যায়। এভাবে এক বছরে ৩-৪টি প্রধান ফসল পর্যন্ত করা সম্ভব হচ্ছে। যেমন- আলু-মিষ্টিকুমড়া বা আলু-ভুট্টা এবং ধান-সরিষা, ধান-কালোজিরা পালাক্রমে চাষ করা যায়।

৯.১.ছ. পয়রা চাষ বা উতেরা চাষ

সাধারনত জমিতে আমন ধান থাকা অবস্থায় ধান কাঁটার আগে ও বর্ষা শেষে কর্দামাক্ত জমিতে খেসারীর ডাল, মটরের ডাল, ছোলার ডাল, মশুরীর ডাল, সরিষা, তিষি, কালোজিরা ইত্যাদি ফসল ছিটিয়ে দেয়া হয়। ধান কাঁটা হয়ে গেলে উল্লেখিত ফসলগুলি ধানের নাড়া বা গোড়ার অবলম্বন করে বেড়ে উঠে। আবার পাট কাঁটার আগে সেইসব

জমিতে ক্ষণ বুঝে বুনো আমন ধানের বীজ ছিটিয়ে আবাদ করা যায় এবং ধান কাঁটার আগে আবার উপরে বর্ণিত বিভিন্ন ডাল জাতীয় ফসলের বীজ ছিটিয়ে দেয়া যায়। আবার মুরিকাঁটা পেঁয়াজ তোলার আগে সেই জমিতে মাটি সামান্য আলগা করে তাতে ধনিয়া, কালোজিরা বীজ বপন করা যায়। সবজির ক্ষেত্রে লাউ শেষ হলে সেই মাচায় ঝিংগে, ধুন্দর, চিচিঙ্গা, চালকুমড়া ইত্যাদি লাগানো যায়। তেমনি বেগুন ও মরিচ ক্ষেতে ফসল শেষের দিকে খাটো জাতের সীম, বরবটি, ধুন্দল দেয়া য়ায়। পালা বা উতেরা চাষ প্রায় কাছাকাছি হলেও কিছুটা পার্থক্য আছে। তবে ২টি পদ্ধতিই বেশ কার্যকরী এবং ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং-এর উল্লেখযোগ্য অংশ।

৯.১.জ. শস্য বহুমুখীকরণ ব্যবস্থাপনা (Multiple Cropping-MC)

মিশ্রচাষ, অন্তবর্তী শস্য চাষ, পর্যায়ক্রমিক শস্য চাষ ইত্যাদি শস্য বহুমুখীকরণ ব্যবস্থাপনার অংশ। থ্রী সিষ্টার, পঞ্চমুখি, নবধান্য, বারআনাজ ইত্যাদি পদ্ধতিতে একই জমিতে একই মৌসুমে বহুরকমের শস্য আবাদ করা হয়। এতে করে নানা জাত ও গোত্রের ফসলের জৈবচক্রে জমির যেমন উর্বরতা বৃদ্ধি পায় তেমনি কৃষকের পারিবারিক পুষ্টি চাহিদাও মিটে এবং অতিরিক্ত ফসল বাজারজাত করে লাভবান হওয়া যায়।

বিভিন্ন স্তরীয় ফসল

৯.১.জ (i) থ্রী সিস্টার: ভুট্টা, বীন বা শিম এবং মিষ্টিকুমড়ো (উত্তর আমেরেকিার আদিবাসিদের মডেল)

৯.১.জ (ii) পঞ্চমুখি: আলু, মূলা, মিষ্টিকুমড়ো, ভুট্টা,ও বরবটি (বাংলাদেশের উত্তর জনপদের মডেল)

৯.১.জ (iii) নব্যধান্য: পাশ্ববর্তী দেশে ৯টি শস্য বীজ একসাথে মিশিয়ে জমিতে ছিটানো হয় জন্য একে নবধান্য বলা হয়। যেমন- অড়হর, জোয়ার, মেন্ডা, বরবটি, মুগ, সয়াবীন, তিল, বাজরা, রেড়ি একসাথে ছিটিয়ে দেয়া হয়। (ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের মডেল)

৯.১.জ (iv) বার আনাজ: ঢেঁমশি, মারুয়া, লোবিয়া, (১ ধরণের সীম), কুলথি, সরিষা/ সূর্য্যমুখি, মারসা (এক ধরণের আংশিক দানা শস্য), ভাট (এক ধরণের সয়াবিন), রাজমা, ফরাসবীন, কলাই, জোয়ার, নওরঙ্গী। (গাড়োয়াল হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলে)

৯.১.জ (v) আইল ফসল, ফাঁদ ফসল, বিতৃষ্ণা ফসল ইত্যাদিও শস্যবহুমুখিকরণের অংশ। যেগুলি পরিকল্পিত উপায়ে করতে পারলে যেমন শস্যবৈচিত্র্য নিশ্চিত সম্ভব হবে, তেমনিভাবে পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই এবং জমির জৈব পদার্থের পরিমাণ বজায় থাকবে। এই সব ফসলের ফলন নিয়ে চিন্তা না করাই শ্রেয়, কারন উক্ত ফসলগুলি মুল ফসলের পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই দমনে যে পরিমাণ উপকার করবে তা টাকার অংকে বিবেচ্য নয়।

৯.১.জ (vi) আইল ফসল এবং ফাঁদ ফসল: ক্ষেতের আইলে এবং ক্ষেতের মাঝে + চিহ্ন নকশা করে আইলের পূর্ব-দক্ষিণ পাশ দিয়ে রবি মৌসুমে ১ লাইন পেঁয়াজ ও রসুন দিতে হবে। তার সাথে ১ লাইন সরিষা বা ধনিয়া/কালোজিরা/তিষি দেয়া যেতে পারে। উঁচু জমি হলে প্রধান ফসলের আইলে আদা-হলুদ চাষাবাদ করা। আর মাঝখানে + চিহ্নে রাই সরিষা, মৌরি, রান্ধুনী অথবা জয়েন ইত্যাদি ব্যঞ্জন পাতা গুলি চাষ করলে ভালো।

৯.১.জ (vii) বিতৃষ্ণা ফসল (Repellent Crop): জমিতে নানা ধরনের বিতৃষ্ণা ফসল লাগাতে হয় কারন বিতৃষ্ণা ফসলের প্রভাবে পোকা-মাকড় খামারে তেমনটি আসতে চায়না। কারণ অনেক পোকা যেমন ফেরোমেনোন বা সঙ্গী পোকার হলুদ গাদা ফুল,কৃষ্ণ তুলশী, রাম তুলশী,কারিপাতা, বাসক পাতা, আদা, রসুন, পেঁয়াজ লাগানো। উল্লেখ্য যে, এইসব গাছ অপকারী পোকাকে শুধু যে বিতাড়িত করে তাই নয় বরং এইসব পোকা যদি কোন কারনে এইসব ফুল বা ফসলে ৩০ সেকেন্ড সময় নিয়ে বসে তবে তাদের প্রজনন ক্ষমতা কার্যতহ্রাস পায়।

৯.১.ঝ. সমন্বিত চাষ ব্যবস্থা (Integrated Farming Syestem)

শুধুমাত্র শস্য বহুমুখিকরণ প্রথা পরিবেশবান্ধব কৃষির জন্য যথেষ্ট নয়। সকল কৃষকেরই উচিৎ সমন্বিত চাষাবাদে গুরুত্ব দেয়া। বিগত ২০-৩০ বছর আগেও গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু এবং পুকুর ভরা মাছ ছিল,কিন্তু এখন আর সেটি আগের মত দেখা যায়

না। হয়তো নির্দিষ্ট ও একক কোন কিছুর ফলন বেড়েছে কিন্তু অন্যগুলি নাই হয়ে গেছে। যেমন বড় কৃষকের ঘরে প্রচুর ধান আছে কিন্তু গরুর লাঙ্গল নেই, গোয়াল ভরা দেশী গরু নেই। আবার কিছু খামারীর গোয়াল ভরা বিদেশী জাতের গাভী আছে কিন্তু তার গোলা ভর্তি ধান এবং অন্যান্য শস্য নেই, আবার কারও পুকুর ভর্তি নির্দিষ্ট কয়েকটি জাতের মাছ আছে, কিন্তু পুকুরে আগের সেই বৈচিত্র্যপুর্ণ মাছ নেই। তারপর পুকুর আছে কিন্তু পুকুরপারে বৈচিত্র্যময় গাছ নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে 'নেই' এর সংখ্যাই বেশি। অর্থাৎ আমরা অসম মুনাফা লাভের আশায় দামী কৃষি উপকরণযুক্ত একক ফসল (Monoculture) চাষের উপর গুরুত্ব দিয়ে বৈচিত্র্যময় সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছি।

কৃষকের জন্য গবাদি পশু-পাখি পালন তার কৃষি কাজের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। কেননা কৃষি করতে হলে জমির সুস্থায়ি স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হবে। আর জমির সুস্থায়ি স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হলে দেশী গরুর গোবর ও দেশি হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা, গৃহস্থালি বর্জ্য, জাবরা, ছোট-বড় গাছপালা, জলাশয় বা জলাধার সবকিছুই লাগে। কৃষকের কাছে কোন কিছুই ফেলনা নয়। তাই আমাদের কৃষি খামার ব্যবস্থাপনাকে সমন্বিতভাবে সাজিয়ে পরিবেশবান্ধব কৃষির বাস্তুতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করতে হবে। যে সমন্বিত খামারে থাকবে ফসল ভরা মাঠ, গোয়াল ভরা দেশী গরু-ছাগল, পুকুর ভরা মাছ, পুকুরের চার ধারে থাকবে বৈচিত্র্যময় ফলের বাগান।

৯.১.ঞ. আচ্ছাদন ফসল বা কভারক্রপ চাষাবাদ

ফসল ও গাছ-পালা লালন-পালনে সূর্য্যের আলো, বাতাস এবং পানি খুবই জরুরী, কিন্তু এই তিনটি অত্যাবশকীয় উপাদানই আবার ভূমির ক্ষয় করে। তাই মাটিকে সুরক্ষা দিতে বছরব্যাপী বিভিন্ন আচ্ছাদন ফসল ফলাতে হবে এবং বিভিন্ন আচ্ছাদন উপাদান ব্যবহার করতে হবে।

প্রতিবছর গ্রীস্মের শুরুতে ও বর্ষা মৌসুমের শেষ পর্যায়ে জমিতে আচ্ছাদন ফসল লাগাতে হবে। কারন ঝড় -বায়ু, রৌদ্র ও অতি বর্ষায় ভূমিক্ষয় হয়, আবার শুস্ক মৌসুমে জমিতে আদ্রতা কমে যায়। তাই ভূমিক্ষয় ও খড়া প্রতিরোধে এবং ঘাস প্রতিরোধে যদি বর্ষার শুরুতে আচ্ছাদন ফসল দিয়ে প্রধান ফসলের ক্ষেত ঢেঁকে দেয়ার ব্যবস্থা করা যায় তবে ভূমিক্ষয় ও ঘাস প্রতিরোধ করা অনেকটা সহজ হয়ে যায়। যেমন খরিপ-১ মৌসুমে বেশিরভাগ ফসল লতানো এবং কন্দ জাতীয় ফসল, এইসব ফসলের সাথে মাটিতে রোপন যোগ্য মিষ্টিকুমড়ো, বাঙ্গি, বরবটি, অড়হড়, মুগ,কলমী শাক, রাঙালু বা মিষ্টি আলু, আলকুশি সীম ইত্যাদি এবং রবি মৌসুমের শুরুতে আগামভাবে মুল ফসলের সাথে বিভিন্ন ডাল জাতীয় ফসল যেমন-মাষকলাই, মুগ ডাল, খেসারী ডাল, মটর, কুলথি ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। এছাড়াও ধৈইঞ্চা, শনপাট, পাটশাক ইত্যাদি দিয়েও দীর্ঘস্থায়ী মালচিং করা যায়। এছাড়াও ধানের জমিতে এ্যাজোলা দিয়ে মালচিং করা যেতে পারে। উল্লেখিত

আচ্ছাদন ফসল ও পদ্ধতি মাটির ক্ষয়রোধ করার পাশাপাশি বেশিরভাগ আচ্ছাদন ফসল মাটিতে নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তেমনি শুকনো খড় ও লতাপাতা এবং অন্যান্য আচ্ছাদন বা মালচিং মাটিতে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ ও জৈব কার্বন যোগ করে এবং হিউমাস উৎপাদনে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। সঠিকভাবে সঠিক মাত্রায় মালচিং করতে পারলে মাটির সঠিক আদ্রতা বজায় থাকে।

মালচিং পদ্ধতিতে ফসল চাষ

৯.১.ট. (i) অ-শস্য উদ্ভিদের রক্ষনাবেক্ষণ

আমরা যাদেরকে আগাছা বা অবাঞ্চিত ঘাস বলছি সেগুলো আসলেই কতটা সত্যি! সুন্দরবন, অ্যামাজন ও হিমালয়ে কোন আগাছার অস্থিত্ব নেই, এমনকি অন্যান্য পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গলে কোন অবাঞ্চিত উদ্ভিদ নেই। যদি থাকতো তাহলে সেখাটায় খাদ্য ঘাটতি দেখা যেতো। এইসব পাহাড়-পর্বত ও বন-জঙ্গলে কেউ কোন বীজ বপন করেনা, পানি সেচ দিতে হয় না, আগাছা দমনে নিড়ানি বা আগাছানাশক দেয় না। কেউ পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে কাজ করে না, কেউ কোন প্রকার সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে না। অথচ এখানটায় কোন খাদ্য ঘাটতিও মনে হয় না, বরং সকল উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে বেড়ে উঠে ও বিভিন্ন গাছ পরস্পরকে সহযোগিতা করে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে টিকে থাকে। আসলে এখানে একটি বিশেষ বাস্তুতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কোন প্রকার মনুষ্য কর্ষণ না হলে এগুলো ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হতেই থাকবে।

১৯৫০ এর দশকে আমাদের উপমহাদেশে আমেরিকা থেকে গমের সঙ্গে আসা পার্থেনিয়ামকে বলা হচ্ছে সবচেয়ে আগ্রাসী আগাছা। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দেখা গেছে যে, এর শিকড়ের রসে পোকা নাশ করার ক্ষমতা আছে।

৯.১.ট. (১) অ-শস্য ফসলের গুণাগুণ

আমাদের ভারতীয় এই উপমহাদেশে ক্ষেত-খামারে জন্মানো বিভিন্ন অ-শস্য উদ্ভিদ আমাদের নানা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ক. **গো-খাদ্যঃ** পরিবেশবান্ধব কৃষি জমির অ-শস্য ফসল নিড়ানি বা পাতলাকরণের পর তা গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। যেমন-দূর্বা, শ্যামা, মুথা, ভাঁদাল বা কেল্লা, বনপাট, বননটে, কাঁটাখুড়ে/খুঁড়েকাঁটা ইত্যাদি। কিন্তুএইসব অ-শস্য উদ্ভিদ রাসায়নিক কৃষিতে জন্মালে সাধারণত গো-খাদ্য হিসেবে তেমনটি ব্যবহার করা হয়না। কারন তাতে মাত্রাতিরিক্ত ইউরিয়া ব্যবহার করায় ফসল অতিরিক্ত সবুজ হয়ে নাইট্রিক পয়োজনে পরিনত হয়। কেহ গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করলেও হঠাৎ দেখা যায় গবাদি পশুর পাতলা পায়খানা হয়েছে, এমনকি পশু মারাও যায়।

খ. **মানুষের খাদ্যঃ** বথুয়া/বেতো, কাঁটানটে, নোনতা, ব্রাহ্মী, থানকুনি, হেলেঞ্চা, পূর্ণভবা, নোনতা বা নুনিয়া, পাটের জমির পাতলাকরণে অতিরিক্ত পাট, শাপলা, পদ্ম, জলকলমি, তিতারি, আমরুল, শুষনি, মারুয়া ও শ্যামা ঘাসের দানা ইত্যাদি মানুষের খাদ্য হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হয়।

গ. **ঔষুধি গুণঃ** দূর্বা, নটে, বননটে, বথুয়া/বেতো, নোনতা, ব্রাহ্মী, থানকুনি, হেলেঞ্চা, তিতারি, বাবুরি, দুধিয়া, মুথা, টেপারী, ভুই আমলা, ঢোলকলমি, কালকাসুন্দা, আপাং, কালমেঘ, শ্বেতদ্রোণ, কুঁচ, ধুতরা, আকন্দ ইত্যাদি বহু রকমের অ-শস্য উদ্ভিদ যাদের চাষ করা হয়না, কিন্তু তারা হাজার হাজার বছর ধরে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের চিকিৎসায় ঔষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

টেপা গাছ

ঘ. ধর্মীয় বা আরাধনার কাজে ব্যবহার: দূর্বা, কাশ, পদ্ম, কুশ, বেনা ইত্যাদি ধর্মীয় বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।

ঙ. উপকারী পোকার আবাসস্থল: জমির আশে-পাশে বা আইলের ধারে থাকা ঝোপ-ঝাড় ও ঝোপ-ঝাড়ের ফুল প্রচুর পরাগ মিলনকারী পতঙ্গের আবাস বা আশ্রয়স্থল। আমরা ঝোপ-ঝাড় পরিস্কার করার ফলে তাদের আবাসস্থল কমে যাওয়ায় পরাগ মিলন ব্যহত হচ্ছে।

চ. বিভিন্ন নির্দেশক: আমরা যাদের আগাছা বলছি তাদের মধ্যে অনেক গাছ ও তৃণ এবং গুল্ম মাটির পিএইচ, উর্বরতা এমনকি মান ও ধরণ নির্দেশ করে। যেমন বৃহত্তর সিলেট, চট্রগাম ও পার্বত্য চট্রগ্রাম এবং বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুরের কিছু এলাকায় প্রচুর ফুটকি গাছ জন্মে যাকে আবার Tea Indicator plant বলা হয়। কাশবন, যজ্ঞডুমুর, ডহর করঞ্জা, হোগলা ইত্যাদি পানির তলদেশ নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া বহু কৃষক আছেন যারা এই সকল অ-শস্য তৃণ দেখে বলে দিতে পারেন কোন জমিতে কি ধরণের ফসল হবে এবং ফলন কেমন হবে।

ফুটকী বা টি ইন্ডিকেটর প্লান্ট

ছ. জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি: অ-শস্য উদ্ভিদ জমির নীচের স্তরের উদ্ভিদ খাদ্য আহোরণ করে উপরের স্তরের মাটিকে উর্বর করছে এবং জমিতে বায়ু চলাচলের পথ সুগম করে। তাছাড়া মাটির ক্ষয় রোধ করে।

৯.১.ট. (২) অতিরিক্ত অ-শস্য উদ্ভিদ বা ঘাস নিবারণ

আমাদের দেশে একক ফসল আবাদের সংস্কৃতি চালু হওয়ায় জমিতে ৮০ এর দশক হতে কিছু কিছু আগাছানাশক ব্যবহার শুরু হয়। কিন্তু ইদানিংকালে তা ব্যবহারের মাত্রা বেড়েছে বহুগুন। দোহাই দেয়া হচ্ছে কৃষি শ্রম কম লাগে এবং শ্রমিক খরচ বেঁচে যায়। কিন্তু যান্ত্রিক কৃষিতে শ্রমিকগণ কর্ম হারালে তারা কি কাজ করবে সেটা কিন্তু আমাদেরই ভাবনা।

আমাদের কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ানোর ফলে জমিতে অতিরিক্ত কর্ষণ চলে। যার কারণে বেশিরভাগ ঘাস কাটিং-এ পরিনত হয় এবং মূল ফসলের চাইতে ঘাস বেশি জন্মায়। কিন্তু যদি জমি গরুর বলদ বা মহিষ দিয়ে হাল-চাষ করা হতো তাহলে এতটা ঘাস জন্মাতো না। তাছাড়া জমিতে জন্মানো অ-শস্য উদ্ভিদ বা ঘাসকে একচেটিয়া আগাছা বলার কোন সুযোগ নেই এবং সব জমিতে ইহা নির্মূল করতে হবে তাও নয়। আমাদের দেশে কৃষি জমি এখন খুব ছোট ছোট হয়ে গেছে যেগুলির অ-শস্য উদ্ভিদ সহজেই নিড়ানি দিয়ে ও পাতলাকরণ করে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তাছাড়া পরিবেশবান্ধব কৃষিতে শস্য বহুমুখিকরণের ফলে এই সকল অ-শস্যজাত উদ্ভিদ এমনিতেই কম জন্মায় ও নিয়ন্ত্রণে থাকে। কভার ক্রপ হিসেবে ডাল জাতীয় এবং পাট জাতীয় ফসল ফলালে অনেক অ-শস্য উদ্ভিদ এমনিতেই নিয়ন্ত্রণে থাকে। আবার পালা শস্য চক্রে অনেক সময় সঙ্গী ঘাস জন্মানোর সুযোগ কম পায়। বিভিন্ন শুকনো খড় ও জাবরা এবং পঁচা কচুরীপানা দিয়ে মালচিং বা আচ্ছাদন দিলে ঘাস নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ফসলে অতিরিক্ত ঘাস হয়ে গেলে পরবর্তী শস্য পর্যায়ে পাট, তিল ও রেড়ি লাগিয়ে দিলে ঘাসের সংখ্যা কমে। জমির আইলে, নীম, ঘোড়া নীম ও করচ গাছ থাকলে ঘাসের বৃদ্ধি ব্যহত হয়। অড়হড়, গ্লাইসিরিডিয়া ইত্যাদি গাছ সবজি আইলে লাগালে ঐসকল গাছের পাতা পড়ে মুথা ঘাসের দমন করা যায়।

জমিতে রাসায়নিক সার ও রাসায়নিক বিষ ব্যবহার না করা হলে শস্য বৈচিত্র্যের কারনে মাটির জৈবিক সত্ত্বা ধীরে ধীরে ফিরে আসবে। তখন সবকিছু অর্থ দিয়ে পরিমাপ করা যাবে না, কারণ আপনার মাটিতে কেঁচো ও অণুজীব যে পরিমাণ উপকার করে তা আর্থিক মূল্যে বিচার করা বোকামি ছাড়া কিছু নয়। এখানে পরিবেশ ও মানবিকতার বিষয়টি বেশি জরুরী।

১০ম পাঠ

ফসলের আন্তঃপরিচর্চা

ফসলের আন্তঃপরিচর্চার অধ্যায়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা জমি তৈরি ও বীজ বপনের পর পরই মাঠের ফসলে বিশেষ নজর দিতে হয় এবং প্রতিদিন ফসলকে পর্যবেক্ষণে রাখতে হয়। ফসলের কোন অস্বাভাবিক পরিবর্তন হচ্ছে কিনা বা রোগ-বালাই ও কীট-পতঙ্গের আক্রমণ এবং অতিরিক্ত ঘাস বা অ-শস্য উদ্ভিদ ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে কিনা। অথবা জমিতে পানির ঘাটতি হলো কিনা, আবার বর্ষার সময় মাঠে অতিরিক্ত পানি জমেছে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সময়মত পালন করতে হবে।

১০.ক. অ-কৃষি সঙ্গী তৃণ ও গুল্মের নিয়ন্ত্রণ

রাসায়নিক কৃষিতে একক ফসলের ক্ষেত্রে অন্য কোন তৃণ, গুল্ম ও উদ্ভিদকে আগাছা বলা হয়। যেমন- রবি মৌসুমে আলু, গম ক্ষেতসহ অন্যান্য ক্ষেতে বথুয়া শাক, নোনতা শাক, কাঁটানটে, খুড়েকাঁটা, টেপা ইত্যাদি জন্মে। তাছাড়া বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন প্রকার অ-কৃষি উদ্ভিদ জন্মায় যেগুলি সময়মতো নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

অতিরিক্ত অ-কৃষি সঙ্গী উদ্ভিদ মূল ফসলের বাড়-বাড়ন্ত কমিয়ে দেয়, বহু ফসল মূল ফসলের সাথে বায়ু, আলো, পানি ও খাদ্যের প্রতিযোগিতা করে। তাতে ফলন কমতে বাধ্য। তাই কৃষক বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক উপায়ে সেগুলিকে আগাছা হিসেবে বিনাশ করে মূল ফসলকে সিঙ্গেল ক্রপে পরিণত করে। তখন দেখা যায় অতিরিক্ত যত্ন করা ফসলেই পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই বেশি হচ্ছে। তাই নিয়ন্ত্রিতভাবে অ-কৃষি সঙ্গী উদ্ভিদকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। জমিতে যেসকল অ-কৃষি সঙ্গী তৃণ বা উদ্ভিদ জন্মাবে সেগুলির মধ্যে মানুষের খাদ্য তালিকায় কোনটি কোনটি যায় তা নির্বাচন করতে হবে এবং সেগুলিতে ফুল-ফল আসার আগেই জমি থেকে তুলে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে।

১০.খ. অতিরিক্ত ঘাস বা সাথী ফসল পাতলাকরণ

আমরা ক্রমশঃ একক ফসল চাষ করায় জমিতে অনেক ঘাস বা অ-কৃষি উদ্ভিদ তাদের অবস্থান ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করেছে। তাই এখন প্রয়োজন মিশ্র চাষাবাদের, কেননা পরিবেশবান্ধব কৃষিতে একই জমিতে বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদ করা হয় সেখানে অবাঞ্ছিত বা আগাছা বলে কিছু নেই শুধু সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হয় মাত্র। এক্ষেত্রে শুধু হাত বাঁছাই বা হাত নিড়ানি দিয়ে অতিরিক্ত ঘাস বা সাথী ফসল পাতলা করতে হবে। যা বিভিন্ন ফসলভেদে ২-৩ বার পর্যন্ত করতে হয়।

১০.গ. ফসলের অতিরিক্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ এবং ফুল-ফল ছাঁটাই

আধুনিক কৃষিতে প্রায়শই দেখা যায় যে গাছে শুধু পুরুষ ফুল বেশি হয়, স্ত্রী ফুলের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। নানাকারনে ব্যাপকভাবে স্ত্রী ফুলের সংখ্যা কমে যাওয়ায় সময়ের প্রয়োজনে লতা জাতীয় সবজির ক্ষেত্রে ২G, ৩G পদ্ধতিতে গাছের অঙ্গ-প্রতঙ্গ ছাঁটাই করলে গাছে স্ত্রী ও পুরুষ ফুলের ভারসাম্যতা আসে এবং ফলন বাড়ে কয়েকগুণ।

লতাজাতীয় (লাউ, মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া, শশা, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গে, ধুন্দল ইত্যাদি) সবজির বীজ মাটিতে দেয়ার পর অঙ্কুরোদগম হলে চার-পাঁচ পাতা গজানোর উপরে মূল কান্ড হতে প্রথম যে শাখা বা প্রশাখা বের হয় তা হলো ১G, কান্ডের কমপক্ষে ৫-৬ পাতার মধ্যে কোন শাখা বের হতে দেয়া যাবে না, শাখা বের হলে তা কেটে দিবো এবং ৫-৬ পাতার পর মাঁচা বা জাংলা পর্যন্ত যেতে গাছের আর কোন শাখা কাটিং করবোনা। মাচা পর্যন্ত যেতে গাছের ১২টি পাতা বা গিট লাগে। ১০ থেকে ১২ পাতা হলে আবার প্রথম যে ১G শাখা ডাল বের হয় তাকে কাটিং করলে ২G হবে এবং এই ২G কে আবার ১২ পাতা পর্যন্ত বাড়তে দিবো এবং ২G এর মাথা কেটে বা ভেংগে দিলে যে শাখা বের হবে তার নাম ৩G, আর এই ৩G শাখাটিই আমাদের কাংখিত শাখা। কারন এখানে স্ত্রী ফুল বেশি আসবে ও ফল ধরা শুরু করবে। প্রয়োজনে এই সংক্রান্ত ইউটিউবে ভিডিও দেখে নিতে পারেন।

তাছাড়া কিছু ফসল আছে যেগুলির প্রাথমিক অবস্থা থেকেই অঙ্গ ছাঁটাই করতে হয় যেমন- বেগুন, টমেটো ইত্যাদি। বেগুন ও টমেটো গাছ যত বড় হবে তত তার শাখ-প্রশাখার ভারসাম্য বজায়ে এবং ফলন বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন স্তরে কিছু অঙ্গ ছাঁটাই করলে গাছের বাড়-বাড়ন্ত যেমন ঠিক থাকে তেমনি ফলন বৃদ্ধি পায় কয়েকগুন। এজন্য টমেটো -বেগুন গাছের চারা রোপনের পর হতে বাড়ন্ত পর্যায় পর্যন্ত সময়ে (৬-১২ পাতা পর্যন্ত) অতিরিক্ত পাতা ও ডাল-পালা ছাঁটাই করতে হয়।

গাছের অপ্রয়োজনীয় ডালপালা কেটে দিলে গাছ প্রচুর আলোবাতাস পেয়ে সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠে এবং রোগ-বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। তাছাড়া অনেক ফসল আছে যেগুলির কিছু ফল ছাঁটাই বা পাতলা করে দিলে রেখে দেয়া ফলগুলি বড় এবং পুষ্ট হয় তাতে করে বাজারদর ভালো পাওয়া যায়। একই বৃন্তে একটি বা দুটি ফল রাখা যেমন- পেঁপে, লাউ বা কুমড়া জাতীয় ফসলের ক্ষেত্রে একই ডগায় একই সময়ে একটি ফল রাখলে ফল দ্রুত বড় হয় এবং বাজারজাত করতে সুবিধা হয়। এছাড়াও কোনভাবে যদি কোন কুমড়ো জাতীয় ফলকে পোকা ছিদ্র করে তবে তা দ্রুত অপসারণ করতে হয়। পোকা আক্রান্ত ফলের জন্য মায়া করলে কৃষকের ক্ষতি হয় কারন ঐ ফলটি বড় হয়ে পরবর্তীতে পঁচে নষ্ট হয়ে যায়। বরং আগে-ভাগে আক্রান্ত ফলটি অপসারণ করলে উক্ত ডগায় আবারও একটি ফল দ্রুত বড় হবে এব সেটির পরিচর্চা করলে কৃষক সুস্থ্য ফসল পাবে।

১০.ঘ.১. সেচ ব্যবস্থা ও পানি নিস্কাশন

আমরা যেকোন ফসল ফলাই না কেন জমি প্রস্তুত করার সময় অবশ্যই জমিকে কয়েকটি ফালিতে ভাগ করে নিবো এবং পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে তারপর ফসল বপন

বা রোপন করবো। কেননা ফসলে যেমন পানি প্রয়োজন হয় তেমনি আবার অতিরিক্ত পানি ফসলের ক্ষতি করে। তাই জমিতে পানি সেচ ও নিস্কাশনের জন্য জমিতে বেড বা ফালি পদ্ধতিতে চাষাবাদ করতে হয়। যাতে করে সেচের অতিরিক্ত পানি সহজেই নিস্কাশন করা যায়। আচ্ছাদন বা মালচিং পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে সবজির ক্ষেত্রে খুব বেশি পানি সেচ দিতে হয় না, তথাপি পানি সেচের প্রয়োজন হলে চেষ্টা করতে হবে যাতে ভু-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করতে না হয়। পানি সেচের জন্য প্রতিটি শস্য মাঠে একটা ছোট জলাধার রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেখান থেকে প্রয়োজনীয় পানি তুলে সেচ কার্যে ব্যবহার করলে ভালো ফলাফল পাওয়া সম্ভব। যদি জলাধার না থাকে তবে সেক্ষেত্রে শ্যালো টিউবয়েল থেকে পানি সেচ দিতে হবে। সবজি ক্ষেতে কখনই প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি সেচ দেয়া যাবে না, পানি জমে গেলে ফসলের ফলন কমে যাবে। তাছাড়া আমরা ফসলে যেভাবেই সেচ দিই না কেন তা যাতে অপব্যয় এবং অপচয় না হয় সে দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। জমিতে সেচ দেয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। যেমন-

১। প্লাবন সেচ ২। নালা সেচ ৩। বর্ডার সেচ

৪। বৃত্তাকার সেচ ৫। ফোয়ারা সেচ

উপরোক্ত সেচ পদ্ধতি গুলির মধ্যে নালা সেচ এবং ফোয়ারা সেচ কৃষকের জন্য সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি কিন্তু ফোয়ারা সেচ পদ্ধতি কৃষকের জন্য ব্যয়বহুল হওয়ায় আমরা শুধুমাত্র নালা সেচ নিয়ে আলোচনা করবো-

নালা সেচঃ নালা সেচ পদ্ধতিতে জমির ঢাল অনুযায়ী ভূমির বন্ধুরতা বা উঁচু-নিচু সাপেক্ষে প্রধান নালা এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফিডার নালা তৈরি করা হয়। অতঃপর প্রধান নালার সাথে জমির ফিডার নালাগুলির সংযোগ করে সেচ দেওয়া হয়। নালার গভীরতা ও দৈর্ঘ্য জমির উঁচু-নিচুর উপর নির্ভর করে। জমি সমতল হলে নালার দৈর্ঘ্য বেশি হবে আর জমি ঢাল বেশি হলে দৈর্ঘ্য কম হবে।

নালা পদ্ধতিতে সেচ দিলে-

ক. সেচের পানি নিয়ন্ত্রণ সহজ হয় ও জলাবদ্ধতার ভয় থাকে না;

খ. সমস্থ জমি সমানভাবে ভিজানো যায়;

গ. পানির অপচয় কম হয়;

ঘ. মাটির ক্ষয় কম হয়;

ঙ. একই পরিমাণ পানি দিয়ে প্লাবন সেচের চাইতে অধিক জমিতে সেচ দেয়া যায়।

১০.ঘ.২. পানি নিস্কাশন

জমিতে পরিমিত পানি যেমন প্রয়োজন তেমনি আবার অতিরিক্ত পানি ফসলের জন্য খুবই ক্ষতিকর। ফসলের জমি থেকে অতিরিক্ত পানি অপসারণ করাকেই পানি নিস্কাশন বলে।

ধানের জমি পানি জমে থাকলে উপকারি কিন্তু পেঁপের জমিতে পানি জমে থাকলে তা ক্ষতিকর কারন পেঁপে পানি সহ্য করতে পারে না। জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে থাকলে নিম্নোক্ত ক্ষতিগুলি হয়-

ক. মাটিতে ফসলের শিকড় এলাকায় বায়ু চলাচলের বিঘ্ন ঘটে। ফলে অক্সিজেনের অভাবে শিকড় তথা গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়।

খ. দীর্ঘদিন পানি জমে থাকার ফলে মাটির বদ্ধ পরিসর পানি পূর্ণ হয়ে পড়ে এতে অক্সিজেন শূন্য হয়ে ফসলের শিকড় পঁচে গাছ মারা যায়।

গ. উপকারি অণুজীবের বৃদ্ধি ব্যহত হয়। অন্যদিকে রোগ সৃষ্টিকারি অনুজীবের সংখ্যা ও সংক্রমণ বাড়ে।

ঘ. কোনো কোনো পুষ্টি উপাদানের প্রাপ্যতা কমে যায়।

পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা:

ক. প্রতিটি জমির ড্রেইন বা নালা এমনভাবে করতে হবে যাতে করে জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে;

খ. কাঁচা নালা প্রতিটি ফসল ফলানোর সময় সংস্কার করে রাখতে হবে;

গ. সম্ভব হলে জমির ঢালু এক কোণায় একটা গর্ত বা জলাধার করে রাখা;

ঘ. বর্ষার সময় অতিরিক্ত পানি জমে গেলে পাম্পের সাহায্যে তা অপসারণ করার ব্যবস্থা নেয়া।

সবজি ক্ষেতে নালা পদ্ধতিতে সেচ ব্যবস্থাপনা ও পানি নিষ্কাশন

১১তম পাঠ

সমন্বিতভাবে ফসলের রোগ-বালাই ও ক্ষতিকর পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা

১১.১.ক. ফসলের রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনা

ফসলের ক্ষতিকর পোকা-মাকড় বিতাড়ক ও বালাই ব্যবস্থাপনার আগে আমাদের জানতে হবে যে, কোন কোন রোগ-বালাই আর কোন কোন পোকা-মাকড় আমাদের ফসলে ক্ষতি করে।

রোগ-বালাই: আমাদের কৃষকগণ ফসলে রোগ-বালাই-এর প্রার্দুভাব কোনটা আর ক্ষতিকর পোকা-মাকড়ের আক্রমণ কোনটা তা প্রায়শই গুলিয়ে ফেলে। তাই এগুলো সম্পর্কে কিছুটা জানা জরুরী। উদ্ভিদের সাধারণ এবং প্রধান রোগ-বালাই চেনার উপায় হলো:

১. **ব্যাক্টেরিয়া বাহিত উদ্ভিদ:** ব্যাক্টেরিয়া আক্রান্ত গাছের কান্ড কেঁটে পানিতে চুবালে পানি জেলের মত আঠালো হবে।

২. **ছত্রাক বাহিত উদ্ভিদ:** ছত্রাক আক্রান্ত গাছের কান্ড কাঁটলে কান্ডের ভিতর কালো-কালো দাগ দেখা যাবে।

৩. **ভাইরাস বাহিত উদ্ভিদ:** ভাইরাস আক্রান্ত গাছের পাতায় ছোপ ছোপ দাগ পড়ে।

৪. **কৃমি আক্রান্ত উদ্ভিদ:** কৃমি আক্রান্ত হলে গাছের শিকড়ে তা প্রথম ধরে এবং শিকড়ে গুটি গুটি দেখা যায়।

সাধারণত উদ্ভিদের রোগ-বালাই বিশেষ কয়েকটি অনুজীবের দ্বারা সংগঠিত হয়। যারা মাটির মধ্যে থেকে যায় এবং একক ফসল রোপন হলেই তাদের আক্রমণ বাড়ে। যেমন- টমেটোর উইল্ট রোগ, মাটির একটি বিশেষ অনুজীবের সংখ্যা বেড়ে গেলে দেখা যায়। আবার প্রতিবছর একই জমিতে একই শস্যের ধারাবাহিক চাষাবাদ করলে রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়। উপরোক্ত রোগ-বালাইগুলি সাধারণত আমাদের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে।

ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং-এ বিভিন্ন রোগ-বালাই দমন ব্যবস্থাপনায় কিছু শর্ত অবশ্যই পালন করতে হয় যেমন-

- ✓ প্রথমেই জমিতে রাসায়নিকের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে এবং আক্রান্ত গাছ তুলে নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে তা জ্বালিয়ে দেয়া ভালো অথবা মাটিতে গর্ত করে পুঁতে রাখতে হবে;
- ✓ প্রতিবছর একই জমিতে একই শস্যের ধারাবাহিক চাষাবাদ না করে ঘুরে-ফিরে শস্য আবাদ করতে হবে;

- ✓ রোগ প্রতিরোধী শস্য বা ফসল ফলাতে হবে; যেমন-সাথী ফসল হিসেবে রসুন, পেঁয়াজ, আদা-হলুদ ইত্যাদি ফসল চাষাবাদ করলে ক্ষতিকর ছত্রাক দমন ছাড়াও ফসলের অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে কাজ করে;
- ✓ আলাদা আলাদা সারিতে এক প্রজাতির মিশ্রচাষ, চক্রাবর্তী শস্য চাষ, শস্য বহুমুখিকরণ করলে রোগের প্রাদুর্ভাব কম হয়;
- ✓ জমির মাঝে মাঝে ধনিয়া, দেশী গাঁদা ফুলের গাছ লাগালে কান্ডের ও শিকড়ের ছত্রাকজাতীয় রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাছাড়া এগুলিতে নেমাটোড বা কৃমি রোগ দমন করা যায়;
- ✓ বায়োডার্মা বা ট্রাইকোডার্মা জাতীয় কম্পোস্ট সার ব্যবহার করলে অনেক ধরণের রোগ-বালাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব;
- ✓ ভুট্টার সঙ্গে সয়াবিনের চাষ বা শস্য পর্যায় অবলম্বন করলে ভুট্টার এ্যানথ্রাকনোজ রোগ কম হয়;
- ✓ আলুর ক্ষেতে ভুট্টা ও ও শনপাটের চাষ থাকলে আলুর ব্ল্যাক স্কার্ফ রোগ কম হয়;
- ✓ আখের ঢলে পড়া রোগ, ছোলার গোড়া পঁচা এবং ঝাড়সীমের কান্ড পঁচা রোগ দমনে মিশ্র চাষ ও শস্য পর্যায় অবলম্বন করলে বেশ কার্যকরী ফলাফল পাওয়া যায়।

১১.১.খ. শস্যের ক্ষতিকর পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণ

শস্যের ক্ষতিকর পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জানার আগে আমরা পোকা আর মাকড়ের মধ্যে পার্থক্য কি তা জেনে নিই-

পোকা: ইনসেক্টা শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত ৬টি সন্ধিযুক্ত পা বিশিষ্ট প্রাণিসমূহকে পোকা বলে। পোকার দেহ মাথা, বক্ষ ও উদর এই তিন অংশে বিভক্ত। পোকার বক্ষ দেশের তিনটি খন্ডাংশে ৩ জোড়া পা থাকে।

মাকড়: এরাকনিডা শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত ৮ পা বিশিষ্ট প্রানি সমূহকে মাকড় বলে। মাকড়সার দেহ দুইভাগে বিভক্ত হলেও দুই খন্ডাংশের সংযোগ স্থল সংকীর্ণ নয়।

রাসায়নিক কৃষিতে বিভিন্ন পোকা-মাকড়কে আমরা নির্বিচারে কীটনাশক ছিটিয়ে মেরে ফেলছি সেগুলির মধ্যে কোনটা আমাদের প্রকৃতির জন্য বন্ধু পোকা আর কোনটি শত্রু পোকা তা আমরা পুরোটা জানিনা। কেননা পৃথিবীতে বিদ্যমান পোকা-মাকড়ের ৯০% প্রকৃতি ও পরিবেশের জন্য উপকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আর সমস্ত পোকা-মাকড়ের মধ্যে ৮৩% হলো মাংসাশী পোকা-মাকড়, ৬% উভয়ভোগী যারা ফসলের তেমন কোন ক্ষতি করেনা। আর ১১% পোকা-মাকড় হলো তৃণ, লতা-পাতা বা ফল ভোজী অর্থাৎ যাদেরকে নিরামিষভোজী বলা যায়। আমাদের দৃষ্টিতে এই ১১% পোকা-মাকড় ক্ষতিকর মনে হলেও আসলে তারা উপকারী ঐসব ৮৩% মাংসাশী বন্ধু পোকার খাদ্য হিসেবে বিবেচিত। আর আমরা যে নির্বিচারে বিষ দেই তার মাত্র ১% বিষ

পোকামাকড় মেরে ফেলতে পারে। বাকী ৯৯% বিষ কাজে লাগেনা অথচ তা আমাদের প্রকৃতির সাথে মিশে যাচ্ছে এবং আমাদের অনেক বন্ধু পোকামাকড় ও প্রাণির জীবনহানি ঘটাচ্ছে। তাছাড়া আমরা জানিনা যে কখন কোন সময়ে কোন শত্রু পোকা দমনে আমাদের কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।

এই সব ক্ষতিকর পোকা-মাকড় দমনে আমাদের ইকোলোজির একটা বিরাট অবদান আছে। কিন্তু তা আজ আমরা হুমকির মুখে ফেলেছি এবং কৃষির ভারসাম্য হারিয়েছি। এক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রাণি সংখ্যায় বেড়ে গেলে কিছু কিছু শস্যের ক্ষতি করে। যেমন উদ্ভিদের মাজরা পোকা, কান্ড ও ফল ছিদ্রকারি বা চিমটা পোকা, ফলের মাছি পোকা, পামড়ি পোকা, গান্ধি পোকা, লেদা পোকা, বিটল পোকা, চুঙ্গি পোকা, সাদা মাছি, জাব পোকা, থ্রিপস, উইল্ট, হুপার, ক্যাটারপিলার, বিছা পোকা, ইঁদুর ইত্যাদির সংখ্যা অধিকহারে বেড়ে গেলে ফসলের ক্ষতি করে। ইকো-সিস্টেমে এইসব ক্ষতিকর পোকামাকড়ের বিপরীতে তাদের কিছু শত্রু প্রাণি থাকে। যেমন- গিরগিটি, টিকটিকি, ব্যাঙ, সাপ, শালিক, দোয়েল, ফিঙে, বাবুই, পেঁচাসহ নানা ধরনের পাখি, মাকড়সা, ফড়িং, ভীমরুল, ভ্রমরা, বোলতা ইত্যাদি ফসলের ক্ষতিকর পোকা-মাকড়ের ডিম ও পোকা-মাকড় খেয়ে তাদের সংখ্যা খুব কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখে। মাঝাড়ি সাইজের ১টা হুতোম পেঁচা প্রতি রাতে প্রায় ৪০ টি মাজরা ও গান্ধি পোকা খায় এবং কমপক্ষে ২টি ইঁদুর খায়।

লেডিবার্ড বিটল

বোলতা

ঘাসফড়িং

ভ্রমরা

মাকড়সা

ভীমরুল

মিরিডবাগ

পেঁচা

বাবুই

ফিঙে

দোয়েল

শালিক

গিরগিটি

টিকটিকি

সাপ

ব্যাঙ

বোলতা অনেক শত্রু পোকার শরীরে হুল ফুঁটিয়ে ডিম পেড়ে রাখে। কিছুদিন পর এই ডিমগুলি ফুটে বোলতার শুককীটরা বেরিয়ে পোষক পোকার দেহের ভিতর থেকে মাংস খেয়ে তাদের মেরে ফেলে।

সূত্র: প্রাকৃতিক কৃষির দর্শন, ভরত মনসাতা, অনুবাদ: তপন পুরকায়স্থ। পতঙ্গরা বন্ধু মীরা পোকা নয়, পৃষ্ঠা ১৬৯-২০০।

ট্রাইকোগ্রামা নামক ডিম পরজীবি পোকা বেগুনের ডগা ছিদ্রকারি পোকা দমন করে।

বিভিন্ন পাখি আমাদের ফসলের শত্রু পোকা খেয়ে তাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে।

এছাড়াও আমাদের পূর্ব পুরুষদের অনুশীলন করা কিছু বিষয় ইকো সিষ্টেমে ক্ষতিকর পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। যেমন-

- ✓ পূর্ণিমা বা অমাবশ্যা মেনে আমরা যদি ফসলের ক্ষতিকর পোকা-মাকড় দমনের উদ্যোগ নেই তাহলে অনেকটা সফল হওয়া যায়। যেমন- প্রতি পূর্ণিমা-অমাবশ্যার আগের দিন ও সেইদিন বিকালে পর পর ২দিন যদি শুধুমাত্র পরিষ্কার পানি জমির ফসলে স্প্রে করা হয় তাহলেও অনেক ক্ষতিকর পোকা-মাকড় দমন হয়। কেননা উক্ত সময়ে জমির ফসলে পানি স্প্রে করলে তাদের প্রজনন ক্রিয়াহ্রাস পায়;
- ✓ চুলার ছাই ব্যবহার করে শত্রু পোকা-মাকড়ের প্রতিকূল পরিবেশ তৈরি ও ডিমকে অকার্যকর করে দেয়া যায়;
- ✓ গো-চনা পঁচিয়ে নির্দিষ্টমাত্রায় পানির সাথে মিশিয়ে ফসলে স্প্রে করলে তা জৈব বালাই ও কীট বিতাড়ক হিসেবে কাজ করে পাশাপাশি ফসলে ফলিয়ার হিসেবেও কাজ করে;
- ✓ ফসলের মাঠে পার্চিং বসানো হলে তাতে পাখি বসে ক্ষতিকর পোকা শিকার করে;
- ✓ ইঁদুর দমনে ফসলের মাঠে শিকারি বিড়াল ছেড়ে দিলে বিড়াল ইঁদুর দমনে সাহায্য করে;
- ✓ ধুপ-ধুনার ব্যবহার করে যেমন মশা-মাছি তাড়ানো যায় তেমনি ফসলের বেশি ক্ষতিকর পোকা সাদামাছির দমন করা যায় ও অন্যান্য মশা-মাছি বিতাড়িত করা যায়।

১১.১.গ. সমন্বিতভাবে রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনা ও কীট-পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

রোগ-বালাই, পোকা-মাকড়, অ-কৃষিজ অতিরিক্ত কিছু উদ্ভিদ ও ইঁদুর প্রভৃতি ফসলের শত্রু। এসব শত্রুকে সময়মতো দমন না করলে ফসলের সুষ্ঠ বাড়-বাড়তি ও ফলন কম হবে। শুধুমাত্র একটি শত্রুকে নিয়ন্ত্রণ করে ভালো ফসল আশা করা যায় না। ভালো ফসল পেতে হলে সম্মিলিতভাবে সবগুলো শত্রু অর্থাৎ পোকা-মাকড়, রোগবালাই, অ-কৃষিজ উদ্ভিদ এবং ইঁদুর প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

সাধারণভাবে কৃষকগণ রোগবালাই দমনের জন্য ছত্রাকনাশক, বিষ বা কীটনাশক যেনতেন ভাবে ব্যবহার করে। এতে কৃষকগণ যদিও তাৎক্ষনিক কিছুটা ফল পান তথাপি এসব বিষের বার বার ব্যবহারের কারনে অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গও এসব বিষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতা গড়ে তোলে। তখন পোকামাকড় আর ঐসব বিষ দিয়ে দমন করা যায় না। তখন নতুন ও আরও মারাত্মক বিষ বেশি ব্যবহার করতে হয়। ফলে আবহাওয়া ও ফসলের মধ্যে বিষ থেকে যায়-যা মানুষ ও গৃহপালিত পশুর ক্ষতি করে। তাছাড়া

ঢালাওভাবে ফসলে বিষ প্রয়োগের ফলে অনেক উপকারী পোকা-মাকড় ধ্বংস হচ্ছে, যার দরুন অনেক ফসলেরই পরাগায়ন দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং ফসলের স্বাভাবিক ফলন কমে যাচ্ছে। যে হারে প্রতিদিন মৌ-মাছিসহ অন্যান্য পরাগমিলনকারী পোকা কমে যাচ্ছে তাতে করে পৃথিবী চরম হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। যেমন পটল, কাকরোল, মিষ্টিকুমড়ো, লাউ ইত্যাতি ফসলে এখন হাত দিয়ে পরাগায়ন করা হচ্ছে, যদি কখনও পরাগ মিলনকারী পোকার অভাবে সরিষা, তিল, ধনিয়া, ডাল, আম, লিচু ইত্যাদি ফসলে পরাগায়ন করতে হয় তাহলে আমাদের তেমন খাবার জুটবে না। যদি না জোটে তাহলে ফসলের রোগ-বালাই, পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণের জন্য সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ব্যবস্থাপনায় রোগ-বালাই, পোকা-মাকড় ও অন্যান্য বালাই নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাসায়নিক ঔষধ ব্যবহার না করে অন্যান্য ব্যবস্থার সংগে সমন্বয় করে একটি সার্বিক কীট ও বালাই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আই,পি,এম কি? (Integreted Pest Management):

আই,পি,এম বা সমন্বিত পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হচ্ছে এমন একটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যাতে রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ নূন্যতম পর্যায়ে রাখার জন্য সমন্বিত ভাবে কয়েকটি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। আই,পি,এম এর অর্থ পোকা নিধন করে পোকাবিহীন বাগান নয় বরং পোকা মাকড়ের আক্রমণকে কমিয়ে আনা, যাতে ফসল উৎপাদন অর্থনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়।

সমন্বিত কেন?

যে কোন একটি উপায়ে বার বার পোকা দমন করলে পোকা বা অন্য প্রাণি তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মিয়ে ফেলে এবং সেই পদ্ধতি আর কার্যকর থাকে না। তাই অধিক কার্যকর ও নিরাপদভাবে পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কয়েকটি উপায় সমন্বিত করে দমন করা দরকার।

আই, পি, এম এর উদ্দেশ্য:

- ✓ পরিবেশ ভারসাম্য বজায় রাখা। অর্থাৎ খাদ্য শৃংখলের (ফুড চেইন) মধ্যে অবস্থান করে একে অপরের খাদ্য ও খাদক হিসাবে উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা।
- ✓ রাসায়নিক কীট নাশক পরিহার করা বা নির্ভরশীলতা যতদুর সম্ভব কমিয়ে আনা যাতে পশুপাখী ও প্রকৃতির কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষতি না হয়।
- ✓ উদাহরণ স্বরূপ- যদি রাসায়নিক কীটনাশক নির্বিচারে যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয় তাহলে অনেক উপকারী পোকা মরে যাবে এবং তাতে ক্ষতিকারক পোকার আক্রমণ আরো বেড়ে যেতে পারে। এছাড়া ক্ষতিকারক পোকার প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাবে।

✓ এক কথায় সমন্বিত পোকা দমন ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হচ্ছে পোকা-মাকড় নির্বিচারে যথেচ্ছ নিধন না করে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ এড়ানো বা প্রতিরোধ করা।

১১.১.ঘ. পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাইয়ের আক্রমণ কমানোর প্রাথমিক ব্যবস্থা

পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই সবজি ফসলের প্রধান শত্রু। বীজ বপন থেকে শুরু করে বীজ সংরক্ষণ পর্যন্ত সময়ে ইহা ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করতে পারে। জমিতে রোগবালাই বা পোকা-মাকড়ের আক্রমণ হওয়ার পরে নয় বরং আক্রমণ যাতে না হতে পারে বা কম হয় তার জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা করণীয়ঃ

১. জমির মাটি ওলট-পালট করে কমপক্ষে ৬ইঞ্চি গভীরভাবে চাষ করতে হবে;

২. রোগজীবাণু ও পোকা-মাকড় আক্রমণমুক্ত সুস্থ-সবল বীজ/চারা লাগাতে হবে;

৩. লাইন করে বেড পদ্ধতিতে বীজ বা চারা লাগাতে হবে;

৪. সময় মত আগাছা দমন করতে হবে এবং ক্ষেত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে;

৫. পর্যায়ক্রমে শাক-সবজি চাষ করা অর্থাৎ কোন জমিতে একই ফসল না জন্মিয়ে বিভিন্ন ফসলের চাষ করতে হবে;

৬. শাক-সবজির মাঝে মাঝে পেঁয়াজ বা রসুনের চারা লাগাতে হবে। শাক-সবজি ছাড়া অন্যান্য ফসলের সাথে পোকা বিতাড়ক গাছ লাগাতে হবে।

সারণি: (৬) পোকা-মাকড়ের বিতৃষ্ণা ফসল চার্ট

মূল ফসলের নাম	বিতৃষ্ণা বা বিদূরক উদ্ভিদের নাম	ছবি	বিতাড়িত পোকা-মাকড়
কুমড়ো জাতীয় ফসল, টমেটো, বেগুন, পটল	গাঁদাফুল		সাদা মাছি, জাব পোকা ও কৃমি বা নেমাটোড বিতাড়ক
আলু, কলা, বেগুন, টমেটো এবং পটল	ধনিয়া		আলুর বিটল পোকা, বিভিন্ন মাকড়/মাইটস, কলার নেমোটোড, পটলের নেমাটোড
বাঁধাকপি, ওলকপি, ব্রকলী	জৈয়েন		এফিড, জেসিড, বাঁধাকপির লেদা পোকা
বরবটি, সীম	রাঙ্গুনী		এফিড, জেসিড, জাব পোকা

মূল ফসলের নাম	বিতৃষ্ণা বা বিদুরক উদ্ভিদের নাম	ছবি	বিতাড়িত পোকা-মাকড়
আলু, বরবটি, সীম	মৌরি		এফিড, জেসিড, জাব পোকা
বাঁধাকপি, শশা	পেঁয়াজ		বাঁধাকপির লেদা পোকা ও সাদা মাছি
সীমগোত্রের	রসুন		শিম্বগোত্রের লেদা পোকা
বাঁধাকপি ও শশা	মূলা		বাঁধাকপি ও শশার লেদা পোকা
শতমূলী	টমেটো		শতমূলীর বিটল
শশা ও গাজর	তুলশী		শশা ও গাজরের মাছি পোকা
আলু, বাঁধাকপি	পুদিনা		এফিড, স্কোয়াশবাগ, সাদামাছি, জাবপোকা, বাঁধাকপির লেদা পোকা
শশা ও গাজর	বাসিল		শশা ও গাজরের মাছি পোকা
সকল ধরণের সবজি	অরিগ্যানো		বিতৃষ্ণা ফসল হিসেবে সবচেয়ে কার্যকরী যা বহু রকমের পোকা বিতাড়ক হিসেবে কাজ করে
শশা ও গাজর	লেমন গ্রাস		শশা ও গাজরের মাছি পোকা
শতমূলী	পার্সলে		শতমূলীর বিটল

মূল ফসলের নাম	বিতৃষ্ণা বা বিদূরক উদ্ভিদের নাম	ছবি	বিতাড়িত পোকা-মাকড়
সীম, শশা ও গাজর	চেভস		এফিড, বিটল, শশা ও গাজরের মাছি পোকা
টমেটো	পিটুনিয়া		টমেটোর লোপার
ধুন্ধল, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গে	ক্যামেলিয়া		বিভিন্ন ফ্রুট ফ্লাই ও সাদা মাছি
ভূট্টা	কসমস		ভূট্টার কৃমি
সকল কচি শাক-সবজি	বুনো লেনটেনা		মশা বা হেলোফেলটিস

সূত্র: গুগল উইকিপিডিয়া

১১.১.৬. সমন্বিত পদ্ধতিতে পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই দমন পদ্ধতি

ফসলের পোকা-মাকড় ও রোগ দমনের জন্য আরও নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

১১.১.৬. (১) প্রাকৃতিক/ভৌত উপায়ে দমন

ফসলের সুষ্ঠ বাড়-বাড়তি এবং ভালো ফলনের জন্য এই পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিকভাবে স্বাভাবিক আবহাওয়ায় পোকা-মাকড় ও রোগজীবানু বেঁচে থাকে এবং বংশবিস্তার করে। স্বাভাবিক আবহাওয়া ও তাপমাত্রার তারতম্য হলে এসবের বংশবৃদ্ধি ব্যহত হয় এবং আক্রমণ কমে যায়। নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে রোগ-বালাই এবং পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

- ✓ ভালো ফলনের জন্য সময়মতো ফসল বোনা বা রোপন করা, প্রচুর আলোবাতাস আছে এমন জায়গায় ফসলের চাষ করা জরুরী;
- ✓ অনেক সময় জমিতে সেচ বা পানি দিয়ে পোকা মারা যায়। আবার অনেক সময় জলাবদ্ধতা কিছু রোগের সৃষ্টি করে যেমন চারার গোড়া পঁচা, তাই সময় মতো জমি থেকে পানি নিস্কাশন করা দরকার;
- ✓ পোকা-মাকড় হাত দিয়ে ধরে বা ফসলের উপর দঁড়ি টেনে পোকা মাকড় কমানো যায়।

১১.১.ঙ. (২) পোকা ও রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের চাষ

বেশি ফলনের জন্য অনেক ফসল রোগ ও পোকা-মাকড় বা রোগ জীবাণুর প্রতি ক্রমাগতভাবে সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। এই অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হলো- যখন কোন ফসল বা জাত রোগ-বালাইয়ের আক্রমণ আর প্রতিরোধ করতে পারে না তখনই তার চাষ বন্ধ করা। সাধারণত নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে রোগ ও পোকা মাকড় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

- ✓ যেসব জাতে রোগবালাই বেশি হয় অথবা রোগ সুপ্ত অবস্থায় থাকে তা যতই ভালো ফসল হোক না কেন সেসব ফসলের চাষ হতে বিরত থাকা; কিছু টমেটো ও বেগুনের জাত আছে সেগুলির জাত পরিবর্তন না করলে টলে পরা রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না;
- ✓ মাল্টি ক্রপিং / মিশ্র ফসল চাষ করা;
- ✓ ক্ষেতের আইলে এবং মাঝে মাঝে বিতৃষ্ণা ফসল চাষ করা;
- ✓ জমির আইলে ফাঁদ ফসল লাগানো;
- ✓ বিভিন্ন রং-এর আঠালো ফাঁদ ব্যবহার;
- ✓ আলোর ফাঁদ ব্যবহার;
- ✓ সেক্স ফেরোমেনোন ফাঁদ ব্যবহার;
- ✓ হাত বাছাই বা নেটিং করে পোকা ধরা;
- ✓ পার্চিং ও লাইভ পার্চিং হিসেবে ধৈইঞ্চা গাছ ব্যবহার করা;
- ✓ বন্ধু ও শিল্প পোকার আবাসস্থল নিশ্চিতকরণ;
- ✓ সঠিক পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ:
- ✓ জমিতে অতিরিক্ত অ-কৃষি শস্য উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণে রাখা;
- ✓ মালচিং বা আচ্ছাদন ব্যবহার করে ফসল রোপন করা;
- ✓ শস্যাবর্তন করে চাষবাদ করা;
- ✓ নিম তৈল ও মেহগনির তৈল ব্যবহার করা:
- ✓ বায়োডার্মা ব্যবহার;
- ✓ ট্রাইকো কম্পোষ্টের নির্যাস ব্যবহার;
- ✓ সোহাগা ব্যবহার:
- ✓ প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরিকৃত জিংক ব্যবহার করা;
- ✓ ফসলকে অটোফেজী প্রদান;
- ✓ অপ্রচলিত শাক ও ফসল চাষ (হেলেঞ্চা, ওলকচু, মানকচু, গাছ আলু, চৈ-পান, গোল-মরিচ)

আঠালো ফাঁদ

সেক্স ফেরোমেনোন ফাঁদ

রোগ-বালাই ও পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণে স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা যায় এবং কৃষক তার ঘরে নিজেই তৈরি করতে পারবে এমন কিছু ঘরোয়া পদ্ধতি বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

১নং পদ্ধতি:

বোর্দো মিক্সার:

ইহা এক ধরনের মিশ্রন যাহা বাড়ীতে চুন ও তুঁতে দিয়ে তৈরি করা যায় এবং ছত্রাকজাতীয় রোগ দমনে বিশ্বে বহুল ব্যবহৃত হয়। ইহা তুলনা মূলকভাবে নিরাপদ এবং সহজলভ্য। ছত্রাক জাতীয় রোগ যেমন- গোড়া পচা, ড্যামপিং অফ, কুমড়ার চুনা পড়া (পাউডারী মিলডিউ), টমেটো, আলুর আর্লি ব্লাইট রোগ বোর্দোমিক্সার দ্বারা দমন করা যায়।

বোর্দো মিক্সার তৈরির উপকরণ

ক. তুঁতে

খ. চুন

গ. মাটির ৩টি পাত্র (২ টি ছোট ১ টি বড়)

ঘ. পরিস্কার পানি (বৃষ্টির পানি হলে ভালো)

ঙ. ২ টি বাঁশের কাঠি বা কাঠের কাঠি

চ. ১ টি ইস্পাতের তৈরি চাকু

ছ. স্প্রেয়ার

বোর্দো মিক্সার তৈরির ধাপ:

১. প্রথমে দুইটি খালি মাটির পাত্র নিতে হবে।

২. একটি মাটির পাত্রে ১লিটার পানিতে ২০ গ্রাম তুঁতের মিহিচূর্ণ মিশ্রিত করুন;

৩. অপর আরেকটি পাত্রে ১ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম চুনের মিহিচূর্ণ মিশ্রিত করুন;

৪. এক রাত বা ১২ ঘন্টা দ্রবীভূত করার জন্য রেখে দিন;

৫. তৃতীয় একটি বড় পাত্রে আগে চুনের দ্রবণটি ঢালুন তারপর তুঁতের দ্রবণ ঢালুন। দ্রবনটিকে বাঁশ বা কাঠের কাঠি দিয়ে মিশ্রিত করুন;

৬. দ্রবণের রঙ নীলাভ হলে দ্রবণটি সঠিক হয়েছে আর রঙ সাদা বা সবুজ হলে বুঝতে হবে চুন বা তুঁতের পরিমাণ বেশি হয়েছে। অল্প পানি মিশিয়ে দ্রবণটি ঠিক করে নিন;

৭. ইস্পাতের চাকু দ্রবণে ১ মিনিট পর্যন্ত চুবিয়ে রাখনু যদি চাকুর চকচকে অংশে লালচে দাগ পড়ে তাহলে মিশ্রণটিতে তুঁতে ও চুনের কিছুটা ঘাটতি আছে। আর যদি কোন দাগ না পড়ে তবে মিশ্রণটি তৈরি হয়েছে;

৮. বোর্দো মিক্সার তৈরির পরপরই তা গাছে প্রয়োগ করুন। এই দ্রবণটি তৈরির পর ৬ ঘন্টা ব্যবহার করা যায়।

সতর্কতা:

- বোর্দো মিক্সার প্রয়োগে কোন কোন ফসলে (বিশেষ করে টমেটো) বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে
- ইহা ফল পাকাতে বিলম্ব করে
- বোর্দো মিক্সার ধাতব পাত্রের ক্ষয় সাধন করে
- তৈরির পর ৬ ঘন্টার বেশি রাখা যাবে না
- ইহা একটি জৈব বিষ, শিশুদের কাছ থেকে দুরে রাখতে হবে
- তৈরির পর হাত ভালোভাবে ধুতে হবে

প্রয়োগমাত্রা: চুন ২০ গ্রাম+ তুঁতে ২০ গ্রামের দ্রবণটি ১০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

বোর্দো মিক্সার এর সুবিধা:

- বোর্দো মিক্সার কয়েকদিন পর্যন্ত গাছে লেগে থাকতে পারে।
- বোর্দো মিক্সার তৈরির উপকরন সহজে পাওয়া যায় এবং দামে সস্তা ।
- ইহা ছত্রাক জাতীয় রোগের বেলায় বেশ কার্যকর।
- বোর্দো মিক্সারে কপার থাকায় ইহা গাছে ক্লোরোফিল সংশ্লেষণে সহায়তা করে।

বোর্দো মিক্সার তৈরি

পদ্ধতি ২:

নিম কীটনাশক

নিমের বীজ থেকে তৈরি ঔষধ/কীটনাশক বিভিন্ন ধরনের মাছি, বিটল জাতীয় পোকা, কীড়া এবং বিছা পোকা দমন করে। ইহা সব পোকাকে মেরে ফেলে না, কিন্তু প্রায়শঃই পোকার খাবার অনুপোযোগি করে দেয় ও পোকাকে বিতাড়িত করে।

নিম বীজ দ্বারা দ্রবণ (ঔষধ) তৈরি করা:

১. নিম ফল যখন সবুজ থেকে হালকা হলুদ রং ধারন করে তখন ইহা সংগ্রহ করতে হবে।

২. নিম বীজের উপরের আঠালো হলুদ অংশ কচলিয়ে ধুয়ে রৌদ্রে শুকাতে হবে।

৩. হাতল যন্ত্র অথবা পাথর দিয়ে বীজগুলো গুড়া করে পানিতে মিশাতে হবে। সারা রাত্রি (১০-১২ ঘন্টা) পানিতে ভিজিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।

৪. ৩ শতাংশ জমির জন্য ১০ লিটার দ্রবন স্প্রে করতে হয়। প্রতি লিটার দ্রবণের জন্য দুই মুঠো ৫০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়।

৫. পরের দিন দ্রবণ কাপড় দিয়ে ছেঁকে স্প্রে করে গাছের উপর ছিটিয়ে গাছের ডালপালা ভালোভাবে ভিজিয়ে দিন।

৬. তৈরি করার পর যথাশীঘ্র জমিতে ব্যবহার করা যায় তত ভালো ফল পাওয়া যায়। দেরি হলে ইহার কার্যকারিতা ধীরে ধীরে কমে যায়।

নিম পাতার ব্যবহার:

নিমের পাতার নির্জাস (রস) কীটনাশক হিসেবে ব্যবহার করে পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ১ ভাগ পাতা এবং ৫ ভাগ পানি একটি পাত্রে নিয়ে ১৫-২০ মিনিট ফুটাতে হবে। পানি ঠান্ডা হলে ঐ পানি আক্রান্ত গাছে স্প্রে দিতে হবে। নিম পাতা বেটে পানিতে মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করা যেতে পারে তবে এক্ষেত্রে টাটকা পাতা ব্যবহার করা ভালো।

এছাড়া সবজি বীজ সংরক্ষণে শুকনো নিম পাতার গুড়া ব্যবহার করা যেতে পারে যা বিভিন্ন পোকার আক্রমণ হতে বীজকে রক্ষা করে।

পদ্ধতি নং ৩

আতা পাতা দ্বারা তৈরি দ্রবণ ব্যবহার

আতা পাতা ও আতা বীজ দিয়ে তৈরি দ্রবণ প্রয়োগ করলে জাব পোকা, কুমড়ার লালবিটল পোকা, বিছা ও লেদা পোকার আক্রমণ কমানো যায়।

- ১ ভাগ ওজনের আতা পাতা পিষে বা থেঁতলে নিয়ে ৫ ভাগ পানির সাথে মিশিয়ে ৩০-৪০ মিনিট রাখতে হবে। তারপর একটি কাপড় দিয়ে ছেকে আক্রান্ত গাছে প্রয়োগ করতে হবে।

- আতা ফলের বীজেও পোকা দমন করা যায়। এক লিটার দ্রবণ তৈরি করার জন্য আনুমানিক দু'মুঠো বা ৫০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়। নিমবীজ দিয়ে তৈরি দ্রবনের মত একই পদ্ধতিতে আতা ফলের কীটনাশক তৈরি করতে হবে।

পদ্ধতি নং ৪

মরিচ দ্বারা পোকা দমন

মরিচের গুড়া দিয়েও পোকা দমন করা যায়। ইহা পোকা-মাকড়ের পাকস্থলীতে বিষ ক্রিয়া ঘটায়। ইহা পিঁপড়া, জাব পোকা, বিভিন্ন রকম কীড়া দমনে সাহায্য করে।

দ্রবণ তৈরি-

- ১০ গ্রাম মরিচের গুড়া ১ লিটার পানির মধ্যে একরাত রেখে দিতে হবে
- ভালো কাপড় দিয়ে ছেকে ঐ দ্রবণে আরও ৫ লিটার সাবানের ফেনাযুক্ত পানিতে মিশিয়ে ফসলের/গাছের উপর ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

ইহা ছাড়াও ছাই ও কেরোসিন, তামাক পাতা, বিষকাঁটালি, নিশিন্দা পাতা, গো-চেনা দ্বারা বিভিন্ন পোকা মাকড় মারা বা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

পদ্ধতি নং ৫

বিষকাঁটালি দ্বারা পোকা নিয়ন্ত্রণ

১ কেজি কাঁচা বিষকাঁটালির পাতা ছোট ছোট করে কেটে শিল-পাটায় ভালোভাবে বেটে নিতে হবে অতঃপর ১০ লিটার পানি যোগ করে ছেঁকে নিয়ে ব্যবহার করা যাবে।

দমন: মাছি পোকা- (আম, বেগুন, পেয়ারা, মুকুল/গুটি আসার সময়)।

পদ্ধতি নং ৬

রসুন, পেঁয়াজ, পিঁপুল ইত্যাদি দ্বারা পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণ

২৫০ গ্রাম রসুন, ২৫০ গ্রাম পেঁয়াজ, ১০০ গ্রাম পিঁপুল মিহি করে বেটে নিয়ে ১ লিটার পানির সাথে মিশ্রণ করতে হবে। অন্যদিকে ২৫০ মিলি পানিতে ৫০ গ্রাম সাবানের গুড়া মিশিয়ে আগের দ্রবণটির সাথে যোগ করে ১ ঘন্টা রেখে দিতে হবে। এবার দ্রবণটির সাথে ৫ গুন পানি যোগ করে ফসলে বিকাল বেলায় স্প্রে করতে হবে।

দমন: কাঠের পোকা, জাব পোকা এবং ছত্রাকনাশক হিসেবে কাজ করে।

পদ্ধতি নং ৭

দেশী গরুর কাঁচা গোবর

(ক) দেশী গরুর ১ কেজি কাঁচা গোবর ১০ লিটার পানির মধ্যে ভালো করে গুলিয়ে নিতে হবে এবং তা খুব ভালোভাবে ছেঁকে নিয়ে ৫ লিটার পানি যোগ করে স্প্রে করা যাবে।

দমন: পাতা খেয়ে ফেলে এমন পোকা, লিফ বিটল, পড সাকিং বাগ, এপিল্যাকনা বিটল, চায়ের লালমাকড়।

(খ) দেশী গরুর ১ কেজি কাঁচা গোবর ৫লিটার পানির সাথে ভালো করে গুলিয়ে নিতে হবে এবং তা মোজাইক ভাইরাস আক্রান্ত গাছের চারপাশে যেখানে গাছের রুটক্যাপ বিদ্যমান এমন জায়গা দিয়ে রিং করে ইহা ব্যবহার করা যাবে।

দমন: কুমড়া জাতীয় ফসলের মোজাইক ভাইরাস দমনে কার্যকর।

পদ্ধতি নং ৮

গো-মূত্র

দেশীয় গাভীর রাত্রিকালীন গো-মূত্র ১০ লিটার পরিমাণ ধরে একটি মাটির পাত্রে নিয়ে এয়ার টাইট করে পাত্রের মুখ পলিথিন দিয়ে বেঁধে মাটির নীচে ১৪/ ২১ দিন পুঁতে রাখতে হবে। ১৪ দিন পর পাত্রের মুখ খুলে তাতে ২-৩ ফোঁটা পানি দিলে যদি বুদবুদ উঠে তাহলে বুঝতে হবে মিশ্রণটি প্রস্তুত হয়েছে। আর যদি বুদবুদ না উঠে তাহলে আবার ৭ দিন মাটির নীচে পুঁতে রাখতে হবে। ২১ দিন পর আর পরীক্ষা করার প্রয়োজন হবে না। এই দ্রবণের সাথে ১০ গুণ পানি যোগ করে ফসলে স্প্রে করতে হয়।

দমন: মোজাইক ভাইরাস, মিলিবাগ, থ্রিপস। ইহা গাছে বা ফসলে স্প্রে করলে ফলিয়ার হিসেবে ইউরিয়া বা নাইট্রোজেনের কাজ করে।

পদ্ধতি নং ৯

রসুন, আদা, হলুদ

রসুনের ব্যবহার: দেশী ১কেজি রসুন মিহি করে বেটে ৫ লিটার পানি যোগ করে ১২ ঘন্টা রেখে দিতে হবে। ১২ ঘন্টা পর দ্রবণটি ভালোভাবে ছেঁকে নিয়ে তাতে আরও ১৫ লিটার পানি যোগ করে স্প্রে করা যাবে।

দমন: লাল মাকড় ও যে কোন ছত্রাকনাশক হিসেবে কাজ করে।

হলুদের ব্যবহার: ১ কেজি হলুদ মিহি করে বেটে ৫ লিটার পানি যোগ করে ১২ ঘন্টা রেখে দিতে হবে। ১২ ঘন্টা পর দ্রবণটি ভালোভাবে ছেঁকে নিয়ে তাতে আরও ১৫ লিটার পানি যোগ করে স্প্রে করা যাবে।

দমন: লাল মাকড়, কৃষি, ছত্রাক/পঁচারোগ, ধানের ক্ষেতেও দেয়া যাবে।

আদার ব্যবহার: দেশী ১ কেজি আদা মিহি করে বেটে ৫ লিটার পানি যোগ করে ১২ ঘন্টা রেখে দিতে হবে। ১২ ঘন্টা পর দ্রবণটি ভালোভাবে ছেঁকে নিয়ে তাতে আরও ১৫ লিটার পানি যোগ করে স্প্রে করা যাবে।

দমন: সবধরনের লাল মাকড়, তিতা পোকা এবং ছত্রাকনাশক হিসেবে কাজ করে।

পদ্ধতি নং ১০

তামাক পাতা ও ন্যাপথলিন

তামাক পাতা ১ কেজি পরিমাণ ৫ লিটার পানিতে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে নিতে হবে এবং পানি ছেঁকে নিতে হবে। উক্ত দ্রবণের সাথে ২৫০ গ্রাম ন্যাপথলিন গুড়া করে নিয়ে ৫০০ মিলি পানিতে দ্রবীভূত করে ছেঁকে নিতে হবে। অতঃপর তামাক পাতা ভিজানো পানি ও ন্যাপথলিনের পানি একত্রে মিশিয়ে তাতে ১০ গুন পরিমাণ আরও নতুন পানি মিশিয়ে গাছে স্প্রে করতে হবে।

দমন: বেগুনের মাজরা পোকা ও ফসলের ডগা/ফল ছিদ্রকারী পোকা, হপার দমন করা যায়।

পদ্ধতি নং ১১

তামাক পাতা ও রিঠা ফল বা সাবান গুড়া

২৫০ গ্রাম তামাক পাতা ৪ লিটার পানির মধ্যে ভিজিয়ে ১৫ মিনিট জ্বালাতে হবে। দ্রবণটি ঠান্ডা করে ছেঁকে নিতে হবে। ২০০গ্রাম রিঠা ফল ৫ লিটার পানিতে একরাত ভিজিয়ে রাখতে হবে। অথবা ৫ লিটার পানির সাথে সাবান গুড়া ১০০ গ্রাম মিশিয়ে আগের দ্রবণটির সাথে যোগ করে স্প্রে করা যাবে।

দমন: মাজরাপোকা, কান্ড ছিদ্রকারী পোকা, ফল ছিদ্রকারী পোকা।

পদ্ধতি নং ১২

গো-চনা ও টক দই

উপাদানের মিশ্রণ: ১/২ লিটার দেশীয় গরুর গো-চনা বা মূত্র (তাজা), ১/২ কেজি টক দই ১০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করা যাবে।

দমন: ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস জনিত যেকোন রোগে কার্যকরী।

পদ্ধতি নং ১৩

সর্বাঙ্গাস্ত্র বা দশপত্র বালাইনাশক

ইহা একটি কীট বিতাড়ক ও ছত্রাকনাশকও বটে।

উপকরণ:

ক. ১টি ২২০ লিটার পানি ধারন সক্ষমতা খালি ড্রাম

খ. পানি ২০০ লিটার (নদীর বিশুদ্ধ পানি হলে ভালো হয়)

গ. টাটকা গোবর ২-৩ কেজি

ঘ. নিম পাতা বাটা ৫ কেজি

ঙ. সম্ভব হলে ৯-১০ ধরণের তিতা পাতা (নীম পাতা, নিশিন্দা পাতা, ভাট পাতা, পদ্মগুলঞ্চ পাতা, ধুতরা পাতা, করলা পাতা, মেহগনি পাতা, কালমেঘ বা কল্পনাথ পাতা, আতা পাতা, বিষকাঁটালি ইত্যাদি পাতাগুলির প্রত্যেকের ২ কেজি পরিমাণ পাতা নিয়ে পাতা বেঁটে নিতে হবে)

চ. গাঁদাফুলের পাতা বাটা ২ কেজি

ছ. তামাক পাতা গুড়া ২ কেজি

জ. দেশী রসুন বাটা ৫০০ গ্রাম

ঞ. কাঁচামরিচ বাটা ৫০০ গ্রাম

ঞ. কাঁচা আদা বাটা ২০০ গ্রাম

চ. মেহগনি বীজ বাটা ২০০ গ্রাম

বিভিন্ন ধরণের তিতা পাতা

নোটঃ প্রয়োজনে উপরের উপকরণগুলির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে পরিমাণ কম-বেশি করা যাবে।

এই উপকরণগুলি ড্রামে দিয়ে ড্রাম ভর্তি পানি দিন এবং ১টা শক্ত কাঠি দিয়ে তা ঘুটে নিন এবং পাটের বস্তা দিয়ে ড্রামের মুখ বন্ধ করে রাখুন। পর দিন থেকে এভাবে দ্রবণটি দিনের যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে এক নাগারে ৭ দিন ২ বেলা ঘাটুন। ভালো ফলাফল পেতে হলে ড্রামটি ছায়াযুক্ত স্থানে ২৮-৪৫ দিন রেখে দিন। তারপর ছেঁকে নিয়ে ১ঃ২০ লিটার অনুপাতে মিশিয়ে ফসলে স্প্রে করুন। ইহা কোন জারকিনে ভরে ছায়াযুক্ত স্থানে ৬ মাস রেখে ব্যবহার করা যাবে।

দমনঃ যেহেতু ইহাকে বলা হচ্ছে সর্বাঙ্গাস্ত্র। তাই ইহা পাতা ও ফল খেকো সকল পোকা-মাকড় দমন ও নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী একটা কীট বিতাড়ক ও কীটনাশক। পাশাপাশি ছত্রাকনাশক হিসেবেও ভালো কাজ করে। সূত্রঃ শ্রী সুভাষ পালেকারের জিরো বাজেট ফার্মিং ও প্রাকৃতিক কৃষির প্রাকৃতিক নিয়ম-শহীদ আহমেদ, পৃষ্ঠা নং ২০।

পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য ব্যবস্থাপনাঃ

১. বেড়া ফসল/ ফাঁদ ফসল/বাফারঃ (Fenc/Trup Cropping)

এই পদ্ধতিতে প্রধান ফসল জমির মাঝখানে বপন করা হয়। আর বেড়া/ফাঁদ ফসল জমির চারপাশে আইলের ধার দিয়ে লাগানো হয়। কারন ফাঁদ ফসল গুলির প্রতি পোকা-মাকড় আকৃষ্ট হয়ে প্রথমে সেগুলিতে বসে ঐগুলিরই ক্ষতি করে ফলে প্রধান ফসলে আক্রমণ কম হয়। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী অন্যান্য কৃষকের রাসায়নিক কৃষির দুষণ ঠেকাতে কাজ করে। ঝড়ো হাওয়া ও পশুপাখির আক্রমণ ঠেকাতে কিছুটা কাজ করে। পাশাপাশি বন্ধু পোকার সংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক ও তাদের আবাসস্থল হিসেবে কাজ করে। ফাঁদ ফসলের জন্য মেস্তা বা চুকাই, ভূট্টা, ঢেঁড়শ, সরিষা, সূর্যমুখী এবং অন্যান্য মধু ফুল বেশ উপযোগি। নীচে কিছু বেড়া/ফাঁদ ফসলের উদাহরণ দেয়া হলো-

১. সবজি ক্ষেতের চারিদিকে সূর্য্যের আলো ছায়া অনুযায়ী তুলশী, বাসিল, ধনিয়া, কালোজিরা, রসুন, পেঁয়াজ, লেমন গ্রাস, বাসক, ভাট বা ভাটি, আকন্দ ইত্যাদি লাগানো যেতে পারে। এগুলো Repellent ও Gravitational হিসেবে পোকা বিতাড়ক ও অবকর্ষকের কাজ করে প্রধান ফসলকে রক্ষা করে।

২. আখের চারিদিকে ও ক্ষেতের মাঝে মাঝে মেস্তা বা শনপাট ও ধনিয়া দিলে আখের ডগা ছিদ্রকারি পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৩. ভূট্টার চারিদিকে জোয়ার/ সুদান ও সূর্য্যমুখি দিলে ভূট্টার পাতা ও কান্ড ছিদ্রকারি পোকা নিয়ন্ত্রণ হয়।

৪. গম ও মটরশুটির চারিদিকে কুসুম ফুল দিলে জাব পোকা নিয়ন্ত্রিণ রাখা যায়।

৫. বেগুনের চারিদিকে ঢেঁড়শ দিলে সাদা মাছি নিয়ন্ত্রণে থাকে

৬. পানের বরজের আশে পাশে কলা গাছ লাগালে পানের সাদা মাছি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

৭. বাঁধাকপির চারদিকে ও মাঝে মাঝে সরিষা দিলে জাব পোকা ও পাতা ছিদ্রকারি পোকার আক্রমণ কম হয়।

৮. আমন ধানের চারিদিকে উঁচু জমিতে খুড়েকাঁটা অথবা নটে শাক দিলে মাঝরা পোকা কম হয়।

৯. আগাম সবজি ক্ষেতে বরবটি দিলে ফল ছিদ্রকারি পোকা দমন করা যায়।

সারণী: ০৭

প্রধান ফসল	ফাঁদ ফসল	পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণ
রবি মৌসুমের সকল সবজি ক্ষেত-খামার	তুলশী, বাসিল, সরিষা, ধনিয়া, কালোজিরা, রসুন, পেঁয়াজ, অরিগ্যানো, লেমন গ্রাস, বাসক, ভাট, আকন্দ	সকল Repellent ও Gravitational হিসেবে পোকা বিতাড়ক ও অবকর্ষকের কাজ করে প্রধান ফসলকে সুরক্ষা দেয়
পটল, করলা	ধনিয়া, গাঁদাফুল	নেমাটোড বা কৃমি
কলা	গাঁদাফুল, ধনিয়া	নেমাটোড বা কৃমি
পেঁপে	চারিদিকে ঢেঁড়শ, ধনিয়া, পেয়ারা গাছ	সাদা মাছি, কৃমি
আখ	চুকাই/ মেস্তা, শনপাট, সূর্য্যমুখি	কান্ড ছিদ্রকারি
ভুট্টা	বাদাম, জোয়ার, সুদান ঘাস, সূর্য্যমুখি,সরিষা	পাতা ও কান্ড ছিদ্রকারি
গম	সরিষা ও কাঁটাযুক্ত কুসুম ফুল	জাব পোকা
বেগুন	চারিদিকে ঢেঁড়শ	সাদা মাছির আক্রমণ প্রতিরোধ করে
পানের বরজ	কলা গাছ	সাদা মাছির আক্রমণ প্রতিরোধ করে
বাধাকপি	সরিষা, রেড়ি, বীট, গাজর	পাতা মোড়ানো, জাব পোকা ও লেদা পোকা নিয়ন্ত্রণ করে
ফুলকপি	রেড়ি ও তামাক, বীট,গাজর	লেদা পোকা নিয়ন্ত্রণ করে
টমেটো	শশা, জোয়ার	সাদা মাছির আক্রমণ ও ফল ছিদ্রকারি পোকা প্রতিরোধ করে
ধান	ধৈইঞ্চা, শুংওয়ালা ধান, খুড়েকাঁটা বা কাঁটাখুড়ে	মাঝড়া পোকা
শশা	চারিদিকে বরবটি ও ঢেঁড়শ	সাদা মাছির আক্রমণ প্রতিরোধ করে
জোয়ার	অড়হড়	শীষ নষ্টকারি পোকা দমন
গাজর	পেঁয়াজ, বাদাম	মাছি পোকা
গোলমরিচ	গাঁদাফুল	নেমাটোড বা কৃমি

সূত্র: কৃষি সার্ভিস সেন্টার, কলকাতা, মানবন, এস আর এবং এস চেলিয়া ১৯৮৬, Influence of Inter cropping legume with sorghum on the infestation of stem borer, in tropical pest Management 32,162-163 (১৪০ নং সূত্র)

বিতৃষ্ণা ফসলসহ আচ্ছাদন পদ্ধতিতে মিশ্র ফসলের চাষ

লাল গেন্দা

সুইট বাসিল

তুলসি

ল্যানটেনা

অরিগ্যানো

পুদিনা

২. অন্যান্য ব্যবস্থাপনার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ফলের জন্য ফ্রুট ব্যাগিং পদ্ধতি পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণে বেশ কার্যকর। যেমন-পেয়ারার জন্য পলিথিন ব্যাগ, আম ও কলার জন্য বিশেষভাবে তৈরি ফ্রুট ব্যাগ। যা কুমড়ো জাতীয় ফসলে ব্যবহার করা যায়।

ফ্রুট ব্যাগ

প্যাকেটজাত বালাইনাশক ও কীটনাশক

ইদানিং কালে বাজারে বেশকিছু বায়ো-পেষ্টিসাইড কোম্পানি তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকার বায়ো-পেষ্টিসাইড বাজারে নিয়ে এসেছে।

সারণী: ০৮

কীটনাশকের নাম	কার্যকারিতা	প্রয়োগমাত্রা
বায়োনিম প্লাস	এফিড, জেসিড, থ্রিপস, মাকড়, বেগুনের মাঝরা, টমেটোর ফল ছিদ্রকারি পোকা, পাতা সুরঙ্গকারি পোকা, সাদামাছি ও মিলিবাগ নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী	প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে।
বায়ো-ক্লিন	সাদামাছি এবং ফল ও ফসলের মিলিবাগ নিয়ন্ত্রণে কাজ করে।	প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে।
বায়ো-চমক	বেগুনের মাঝরা পোকা নিয়ন্ত্রণে কাজ করে	প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে।
ইকোম্যাক	মাকড় ও শোষক পোকা, পাতা খেকো পোকা এবং পাতা সুরঙ্গকারি পোকা নিয়ন্ত্রণে কাজ করে।	প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে।
বায়ো-এনভির	শশা জাতীয় ফসলের মোজাইক ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে কাজ করে।	প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে।
বায়ো-শ্লিড	ক্ষতিকারক অনুজীব ছত্রাক ও ব্যাক্টেরিয়া নিয়ন্ত্রণে সফলভাবে কাজ করে।	প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে।

কীটনাশকের নাম	কার্যকারিতা	প্রয়োগমাত্রা
বায়োডার্মা সলিড	কার্যকরী জৈব ছত্রাক নিয়ন্ত্রক	জমি তৈরির শেষ চাষে বিঘা প্রতি ৮-১০ কেজি
কে-মাইট	মাকড় ও শোষক পোকা নিয়ন্ত্রক	প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে।
বায়োট্রিন	শোষক জাতীয় ক্ষতিকর পোকা-মাকড় দমনে কার্যকর	প্রতি লিটার পানিতে ১.৪ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে
ফউলিজেন	ভুট্টা, বাদাম, তুলা ইত্যাদি ফসলের ফল আর্মিওয়ার্ম পোকা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর	প্রতি ৫ মিলিলিটার ১৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে
কিউ-ফেরো (সেক্স ফেরোমেনোন টোপ)	কুমড়া জাতীয় সবজির মাছি পোকা দমনে কার্যকর	বিঘা প্রতি ৬-৮ পিস
ব্যাকট্রো-ডি (সেক্স ফেরোমেনোন টোপ)	আম-পেয়ারার মাছি পোকা দমনে কার্যকর	গাছ প্রতি ২-৩ পিস
ফল আর্মি লিউর (সেক্স ফেরোমেনোন টোপ)	ভুট্টার ফল আর্মিওয়ার্ম	বিঘা প্রতি ৫-৬ পিস

কতিপয় ফসলের রোগ এবং এর দমন ব্যবস্থা

সারণী: ০৯

রোগের নাম	আক্রান্ত ফসলের নাম	প্রতিকার ব্যবস্থা
সাদা মরিচা	শাক-সব্জি ও ডাঁটা শাক	আক্রান্ত অংশ ধ্বংস করে ফেলতে হবে।
মোজাইক ভাইরাস	ঢেঁড়স, টমেটো, পেঁপে, মিষ্টিকুমড়া, আলু, শঁসা , বাধাঁকপি।	আক্রান্ত গাছগুলো উপড়ে ফেলতে হবে এবং জাবপোকা, পাতাফড়িং ও অন্যান্য বাহক পোকা যাতে রোগ ছড়াতে না পারে সেজন্য আক্রান্ত গাছ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
পাতা মোড়ানো ভাইরাস	ঢেঁড়স, মিষ্টিকুমড়া, টমেটো, বেগুন	তাৎক্ষণিক ভাবে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে এবং আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।
পাতায় দাগরোগ	বাধাঁকপি, পুইশাক, পালংশাক, মুলা, সীম, টমোটো, লাউ, বেগুন, করলা	আক্রান্ত গাছগুলো আংশিক বা সম্পূর্ণ উপড়ে ফেলতে হবে। বোর্দো মিক্সর প্রয়োগ করতে হবে। আগাছা পরিষ্কার করে ও শস্য পর্যায় অবলম্বন করে ভাল ফল পাওয়া যায়।
ঢলে পড়া রোগ	বাধাঁকপি, ফুলকপি, টমোটো, বেগুন	রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে এবং পানি নিষ্কাষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। গাছ আক্রান্ত হলে বোর্দো মিক্সার প্রয়োগ করতে হবে।

রোগের নাম	আক্রান্ত ফসলের নাম	প্রতিকার ব্যবস্থা
ফিউজারিয়াম	বাধাঁকপি, ফুলকপি, টমোটো, বেগুন,সীম, শশা	রোগ প্রতিরোধী জাতের বীজ ব্যবহার, শস্য চক্র অবলম্বন, আক্রান্ত গাছ উপরে ফেলা ও বোর্দো মিক্সার প্রয়োগ করা
পাউডারি মিলডিউ	টমেটো, বেগুন, লাউ,মিষ্টি কুমড়া, সীম, শশা	নিয়মিত আগাছা দমন,নীম পাতার নির্যাস, রিঠা ফলের পানি / বোর্দো মিক্সার স্প্রে করতে হবে
ডাউনি মিলডিউ	পালং শাক, লাউ, সীম, মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া, করল্লা	আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা, রিঠা ফলের পানি ব্যবহার ও বোর্দো মিশ্বর স্প্রে করা

✓ যেসব জাত রোগবালাই এবং পোকার আক্রমন প্রতিরোধ করতে পারে তাহা আবাদ করা যেমন ঢেঁড়শের বারি-১ জাত মোজাইক ভাইরাস সহনশীল এবং আবাদের জন্য এই জাত নির্বাচন করা।

যান্ত্রিক পদ্ধতিতে দমন

পোকা মাকড় ও রোগ বালাইয়ের আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় এ পদ্ধতি বেশ কার্যকর। প্রত্যহ ফসল পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে রোগ বা পোকা দমন করতে হয় বিধায় ইহাতে সময় বেশি লাগে।

✓ এ পদ্ধতিতে হাত দিয়ে, জাল দিয়ে বা আলোর ফাঁদ (এ পদ্ধতিতে রাতের বেলা জমির মধ্যে হ্যারিকেন অথবা হ্যাজাক লাইট, সোলার বাতি জ্বালিয়ে তার নীচে একটি পাত্রে কেরোসিন মিশ্রিত পানি রাখতে হবে) ব্যবহার করে, পোকা-মাকড় ও পোকার ডিম সংগ্রহ করে মেরে ফেলা হয়। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাৎক্ষণিকভাবে জাব পোকা ও লেদা পোকা মেরে ফেলা যায়।

✓ আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে বা আক্রান্ত ডগা বা পাতা ছিঁড়ে মাটিতে পুতে কিছু কিছু রোগ দমন করা যায়।

✓ ফসলের অটোফেজি- ছত্রাক, ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াজনিত কারনে ফসলে সমস্যা দেখা দিলে ফসলকেও অটোফেজি অবস্থায় রাখলে ফসলের রোগ নিয়ন্ত্রণে আসে। অর্থাৎ আক্রান্ত গাছে উক্ত সময়ে কোন কিছুই ব্যবহার করার দরকার নেই এমনকি পানিও দেয়া যাবে না। প্রাণির ন্যায় উদ্ভিদকেও অটোফেজি অবস্থায় রাখলে গাছ তার আক্রান্ত কোষগুলিকে খাবার হিসেবে আগে খেয়ে নিবে। ছত্রাক, ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত অবস্থায় কৃষকগণও ফসলে কোন খাবার এবং পানি সেচ দেয়া থেকে বিরত থাকে।

✓ আক্রমণের সম্ভাব্য অঙ্গ পাতলা কাপড়, পলিথিন এবং ফ্রুট ব্যাগ দিয়ে ঢেঁকে রেখে রোগ ও পোকার বিস্তার রোধ করা যায়। যেমন পেয়ারা, আম, ডালিম, কলা, কুমড়া জাতীয় প্রভৃতি গাছের ফল পাতলা কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখলে প্রজাপতি বা ফলের মাছি পোকার আক্রমণ কম হয়।

সোলার আলোর ফাঁদ

জৈবিক পদ্ধতিতে দমন

প্রকৃতিতে অনেক পোকামাকড় আছে যেগুলো ফসলের অনিষ্টকারী পোকামাকড় দমনে সাহার্য করে। যেমন-

- ✓ জমিতে হাঁস-মুরগী ছেড়ে দিয়ে কিছু কিছু পোকা ধ্বংস করা যায়;
- ✓ ফসলের জাব পোকা দমনে লেডিবার্ড বিটল খুব কার্যকরী ভূমিকা রাখে;
- ✓ পরজীবি আরও পোকা যেমন- নেকড়ে মাকড়শা, ঘাসফড়িং, ড্যামসেল মাছি, মিরিডবাগ, বিভিন্ন ব্রাকন ইত্যাদির সংখ্যা বৃদ্ধি করে শত্রু পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়

প্রয়োজনীয় টিপস

- ✓ ক্ষেতের আইলে বড় আমগাছ থাকলে সেখানে গিরগিটি, বিভিন্ন পাখি, মৌমাছি,বোলতা, পিঁপড়া ইত্যাদি বাসা বাঁধে;
- ✓ ফসলের মাঠে তাল গাছ থাকলে বাবুই পাখি, বাদুড়, গন্ধগোকুল আসে;
- ✓ বড় ঝোপ-ঝাড় থাকলে সাপ, গিরগিটি, ব্যাঙ, গুবরে পোকা, মাকড়সার আবাসস্থল গড়ে উঠে;
- ✓ ক্ষেতের জমিতে মাঝে মাঝে ছোট-ছোট গর্ত করে রাখলে সেখানে পানি জমার ব্যবস্থা করলে তাতে ব্যাঙাচি ও নানা প্রকার পানি পোকার বসবাস করার সুবিধা হয়।

পরিচর্যা পদ্ধতিতে দমন

ফসল আবাদে বিভিন্ন পরিচর্যার মাধ্যমে রোগ বালাই এবং পোকা মাকড় দমন করা সম্ভব।

নিম্নে বিভিন্ন পরিচর্যাগত ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হলো:

সময়মত জমি ভালোভাবে চাষ করা

গভীরভাবে জমি চাষ করে এবং উত্তম রুপে মই দিয়ে মাটি উলোট-পালট করে দিলে অনেক ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও কীড়া এবং রোগজীবানুর বের হয়ে আসে এবং পরভোজী প্রাণী ইহা খেয়ে ফেলে। জমি ভালোভাবে চাষ করলে গাছের জঞ্জাল যা পোকামাকড় ও রোগজীবানুর আবাস স্থল তা নষ্ট হয়ে যায় ফলে পোকামাকড় ও রোগবালাই প্রতিরোধ সম্ভব হয়।

সঠিক দুরত্বে চারা লাগানো বা বীজ বোনা

সঠিক দুরত্বে চারা লাগালে বা বীজ বুনলে ফসল ঠিকমত আলোবাতাস ও খাদ্য পেয়ে বেড়ে উঠে। এতে করে ফসল সুস্থ্য ও সবল হয় এবং রোগ ও পোকামাকড় তেমন ক্ষতি করতে পারে না।

মই দিয়ে মাটি প্রস্তুতকরণ

১২তম পাঠ

কৃষি পরিবেশ অঞ্চলভিত্তিক চাষ বা স্থানীয় ফসল চাষাবাদ

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। প্রায় সব ফসলই বাংলার মাটিতে জন্মায় কিন্তু সব ফসল সব এলাকায় আশানুরূপ ফলন দেয়না। ফসল উৎপাদন নির্ভর করে ঐ এলাকার জলবায়ু ও পরিবেশের উপর। অতএব এদেশে ফসল ফলাতে হলে প্রত্যেক কৃষককে এলাকাভিত্তিক কৃষি পরিবেশ জানা দরকার। অর্থাৎ কৃষি পরিবেশ অঞ্চল কৃষি কার্যক্রমে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়।

আমরা জানি ছোট এই বাংলাদেশে কোথাও বৃষ্টিপাত বেশি আবার কোথাও বৃষ্টিপাত কম হয়। কোথাও তাপমাত্রা কম আবার কোথাও কিছুটা বেশি। তাছাড়া একেক অঞ্চলের মাটিও একেক রকম। এসবই হলো এলাকা ভিত্তিক কৃষি পরিবেশ। এ পরিবেশের জন্যই আমাদের বিশ্বাস করা জুরুরী যে, সৃষ্টিকর্তা সবকিছু ব্যালেন্স করে সৃষ্টি করেছেন এবং যে এলাকায় যা দরকার তিনি সে এলাকায় তাই দিয়েছেন। অর্থাৎ এলাকাভিত্তিক যে ফসল ভালো জন্মে (মাতৃ নিবাস/ আদি নিবাস/অরিজিন) সে এলাকায় ঐ সব ফসল চাষে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। যে অঞ্চলে যে জাত ভালো জন্মে সে অঞ্চলে সেটাই করা উচিত যেমন শেরপুর, নেত্রকোনা অঞ্চলে তুলসীমালা এবং বিরুই ধান চাষ। দিনাজপুর, বরেন্দ্র অঞ্চল, উপকূলীয় ও হাওড়-বাওড়ের এলাকাভিত্তিক সুগন্ধী ধান চাষ। বৃহত্তর বগুড়া, বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর এবং মুন্সীগঞ্জে আলু চাষ। বৃহত্তর পাবনা, বৃহত্তর ফরিদপুর, সিরাজগঞ্জ ,মেহেরপুর এবং নাটোরে পেঁয়াজ -রসুন চাষ। বৃহত্তর রাজশাহী, বৃহত্তর দিনাজপুর, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর এলাকায় আম ভালো জন্মায় আবার দিনাজপুর, রাজশাহী ও ঈশ্বরদী এবং সোনারগাঁও এলাকায় লিচু ভালো হয়। শ্রীমঙ্গল, পঞ্চগড় এবং চট্টগ্রামে চা জন্মায়। তাই সর্বশেষ ১৯৮৮-১৯৮৯ সালে বাংলাদেশকে ৩০টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে উপজেলা পর্যন্ত ভাগ করা হয়েছে। কৃষি উৎপাদনের জন্য ফসল নির্বাচন, ফসল পরিচর্যা, রোগ-বালাই দমন ও ব্যবস্থাপনা এই সকল ক্ষেত্রে কৃষি পরিবেশ অঞ্চল বিবেচনায় নেয়া হয়।

উক্ত পরিবেশ অঞ্চল গঠনে কতগুলো নির্দিষ্ট বিষয় বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। যেগুলো হলো- ভূমি, কৃষি আবহাওয়া, মৃত্তিকা এবং পানি পরিস্থিতি। যার প্রতিটি ক্ষেত্রে আবার বিভাজন রয়েছে। ভূমিকে ৫ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- উঁচু ভূমি, মাঝারি উঁচু ভূমি, মাঝারি নিচু ভূমি, নিচু ভূমি এবং অতি নিচু ভূমি।

কৃষি আবহাওয়া প্রসঙ্গে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে খরিপ-পূর্ব আবহাওয়া, খরিপ আবহাওয়া, রবি আবহাওয়া এবং চরম তাপমাত্রা।

মৃত্তিকার শ্রেণি বিবেচনায় বেলে মাটি, এঁটেল মাটি, বেলে দোআঁশ, এঁটেল দোআঁশ এবং এর পাশাপাশি মাটির পিএইচ বিবেচ্য।

পানি পরিস্থিতি বা মাটির আদ্রতার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এছাড়া নদীর অববাহিকা, হাওড়-বাওড় এলাকাও বিবেচনায় নেয়া হয়।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল অনুযায়ী ফসল বৈচিত্র্য

কৃষি পরিবেশের কারণে এক এক অঞ্চলে আমরা এক একটি বিশেষ ফসল দেখতে পাই। যদিও ধান, পাট, গম, আলু, কপি, টমেটো ইত্যাদি ফসল প্রায় সব এলাকাতেই হয় এবং কৃষক পরিবারের প্রয়োজনে ফলাতে হয়। তথাপি কৃষি পরিবেশ অনুযায়ী ফসল বিবেচনা করলে ফসলের প্রাধান্য দেয়া যায়। যেমন-

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১: পুরাতন হিমালয় সমভূমি অঞ্চলটি বৃহত্তর দিনাজপুর তথা দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড় নিয়ে গঠিত। এখানের বিশেষ প্রধান ফসল ধান, লিচু এবং আম হলেও এই এলাকায় চা এবং কমলা সম্প্রসারিত হচ্ছে।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ২: সক্রিয় তিস্তা প্লাবিত ভূমি অঞ্চলে রয়েছে তিস্তার চর। নীলফামারী, লালমনিরহাট এবং কুড়িগ্রাম জেলার কিছু কিছু অংশ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার বিশেষ ফসল চীনাবাদাম, কাউন। কিন্তু বর্তমানে সেখানে ভুট্টা, মিষ্টিকুমড়া এবং কলার চাষ হচ্ছে ব্যাপক হারে।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ৩ ও ৪: তিস্তা বাঁক এবং করতোয়া ও বাঙালি প্লাবিত ভূমি অঞ্চল হলো বৃহত্তর রংপুর ও বগুড়ার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত। এ অঞ্চলের প্রধান আবাদ হলো তামাক, আখ এবং সবজি।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ৫ ও ৬: নিম্নতর আত্রাই ও পূর্ণভবা প্লাবিত বৃহত্তর চলনবিল, আত্রাই ও পূর্ণভবা নদী এলাকার নিচু জমি নিয়ে গঠিত যা নওগাঁ, নাটোর এবং চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। এ এলাকার বৈশিষ্ট্য হলো পাটি ও বেত উৎপাদন। কিন্তু এখন সাম্প্রতিককালে উক্ত অঞ্চলে আম এবং ধান, তরমুজ ও রসুন ব্যাপকভাবে চাষ হচ্ছে।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ৭: কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা এবং সিরাজগঞ্জ জেলার ব্রহ্মপুত্র ও যমুনার চর এলাকাগুলো। এখানে চীনাবাদাম, মিষ্টিকুমড়া এবং মরিচ ভালো হয়।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ৮: নতুন বহ্মপুত্র ও যমুনা প্লাবিত অঞ্চলে শেরপুর ও জামালপুর জেলার অংশ বিশেষ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এ এলাকায় চীনাবাদাম ও পানি ফল বেশি হয়।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ৯: পুরাতন বহ্মপুত্র প্লাবিত অঞ্চলে শেরপুর ও জামালপুর, ময়মনসিংহ এবং টাংগাইল জেলা পরেছে। এই অঞ্চলে প্রায় সকল ফসলই হয়।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১০: এই অঞ্চল জুড়ে রয়েছে বিস্তৃর্ণ পদ্মার চরাঞ্চল। চাপাইনবাবগঞ্জ এবং রাজশাহী জেলার সক্রিয় গঙ্গা প্লাবিত ভূমি অঞ্চল। যেখানে চীনাবাদাম ও ডালজাতীয় শষ্য ভালো জন্মায়।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১১: পুরাতন গঙ্গা বিধৌত এলাকা বৃহত্তর যশোর, ঝিনাইদহ এবং সাতক্ষীরার অংশবিশেষ এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত। প্রধান ফসল হলো কার্পাস তুলা এবং সবজি।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১২: নিচু গঙ্গা নদী প্লাবিত পদ্মার পার। বৃহত্তর ফরিদপুর, মাদারীপুর এবং পাবনা জেলার অনেক এলাকা নিয়ে গঠিত। এ অঞ্চলের বিশেষ ফসল হলো বুনো আমন, বিভিন্ন ডাল, পাট, ধনিয়া কালোজিরা এবং পেঁয়াজ ও রসুন। এছাড়াও আখ ও সবজি ভালো হয়।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১৩: গঙ্গার জোয়ার-ভাটা প্লাবিত নিম্নাঞ্চল। ইহা খুলনা এলাকার উপকূলীয় এলাকা। এখানে রয়েছে সুন্দরবন।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১৪: গোপালগঞ্জ ও খুলনার বিল অঞ্চল। তালগাছ, খেজুর এবং বোনা আমন।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১৫: আড়িয়াল বিল এলাকা এখানে বোনা আমন ও মিষ্টিকুমড়া বিখ্যাত।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১৬: মধ্য-মেঘনা নদী প্লাবিত ভূমি অঞ্চল। এই এলাকা কুমিল্লা, ব্রাহ্মনবাড়িয়া ও চাঁদপুরের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। এই এলাকায় সবজি ও কলা ভালো জন্মায়।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১৭: নিম্নতর মধ্য-মেঘনা নদী প্লাবিত অঞ্চল। কুমিল্লা ও নোয়াখালীর সীমান্ত এলাকা। এখানে চীনাবাদাম ও ভুট্টাসহ সাধারন ফসল জন্মায়।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১৮: নতুন মেঘনা নদী প্লাবিত কৃষি অঞ্চলে রয়েছে ভোলো ও নোয়াখালির চর। এখানে নারিকেল, সুপারি, পান বিশেষ ফসল। ইদানিং ভালো তরমুজ হয়।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১৯: পূর্ব মেঘনা এলাকায় কুমিল্লা, ব্রাহ্মনবাড়িয়া ও চাঁদপুরের অনেক অংশ নিয়ে গঠিত। এখানকার প্রধান ফসল হলো বোনা আমন।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ২০: বৃহত্তর সিলেটের টাঙ্গুয়ার হাওরসহ অন্যান্য হাওড় এলাকা। এখানে বোরো ধান এবং দেশীয় মাছ উৎপাদন।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ২১: এখানে রয়েছে সুরমা ও কুশিয়ারার দুই পার, সাথে সুনামগঞ্জের অনেক এলাকা। এখানে বোরো ধান, মাছ এবং সবজি উৎপাদন হয়।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ২২: উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ের পাদদেশগুলো। যেমন নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার এবং সিলেট জেলার কিছু অংশ। ধান, লেবু, সুপারি, কমলা, খাসিয়া পান ও চা বিখ্যাত।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ২৩: চট্রগাম ও কক্সবাজারের উপকূলীয় অঞ্চল। এখানকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ফসল হলো পান।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ২৪: সেন্টমার্টিন কোরাল দ্বীপ বা প্রবাল দ্বীপ অঞ্চল। এখানকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উদ্ভিদ হলো নারিকেল। তাছাড়া কক্সবাজার থেকে টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ অঞ্চলে এখন তরমুজ, পেঁপে, রকমেলন, হানিডিউ ভালো হচ্ছে।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ২৫, ২৬ এবং ২৭: এই অঞ্চলের বিশেষ এলাকাজুড়ে আছে রাজশাহী, বগুড়া এবং দিনাজপুরের বরেন্দ্র অঞ্চল। এখানে উঁচু অঞ্চলে প্রায় সকল ফসলই ফলে।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ২৮: টাঙ্গাইলের মধুপুর থেকে ঢাকার তেজগাঁও অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃর্ণ। শাল কাঠ, কাঁঠাল এবং আনারস হলো বিখ্যাত ফসল। পাশাপাশি প্রচুর পরিমানে লেবু ও কলা পাওয়া যায়।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ২৯: সকল পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকা নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এখানে চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার এবং অন্যান্য এলাকার পাহাড়ী অঞ্চলগুলি অন্তর্ভুক্ত। এখানকার বিশেষ ফসল চা, আদা, হলুদ, কলা এবং বিভিন্ন প্রকার কঁচু।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ৩০: কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ৩০-এ রয়েছে নরসিংদী ও আখাউড়ার লালমাটি অঞ্চল। এখানে ভালো জন্মায় সবধরনের সবজি, অমৃত সাগর কলা, কাকরোল এবং মুকুন্দপুরী পেয়ারা।

এই বিস্তৃত বিবরণের মূল উদ্দেশ্য হলো এই কথাটি জানানো যে, বাংলাদেশ ছোট দেশ হলেও এর কৃষি বৈচিত্র্য বিশাল। যাহোক, পরিবেশ অঞ্চল ৩, ৯, ১১ এবং আংশিকভাবে ১৬ কৃষি অঞ্চল হলো উদার কৃষি পরিবেশ এলাকা। এই এলাকাজুড়ে উৎপন্ন ধান-পাটসহ নানা ফসলের জন্য বাংলাদেশ 'সোনার বাংলা' নামে অভিহিত।

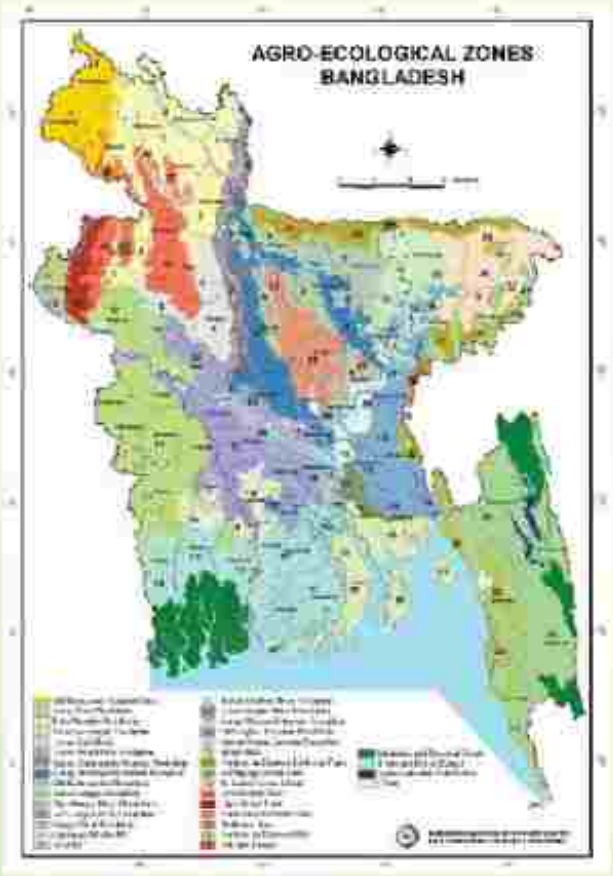

কৃষিপরিবেশের অঞ্চলভিত্তিক বাংলাদেশের ম্যাপ

১৩তম পাঠ

মৌসুমভিত্তিক ফসল চাষাবাদ

ইকোলোজিক্যাল কৃষির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হলো মৌসুমের ফসল মৌসুমেই চাষ। এখানে কোন ফোর্স বা জোড়-জবরদস্তি করে ফসল ফলানো যাবে না। আমাদের কৃষিতে প্রধান তিনটি মৌসুম হলো (ক) রবি মৌসুম, (খ) খরিপ-১ মৌসুম এবং (গ) খরিপ-২ মৌসুম। সকল ফসল মৌসুম অনুযায়ী করা উচিত। কেননা এক মৌসুমের ফসল অন্য মৌসুমে করলে কৃষক লাভের চাইতে ক্ষতির সম্মুখীন বেশি হয়। আর খরিপ-১ এবং খরিপ-২ মৌসুমের ফসল রবি মৌসুমে এবং রবি মৌসুমের ফসল খরিপ মৌসুমে ফলানো যেমন ঠিক নয় তেমনি ক্রেতা/ভোক্তাদের খাওয়া উচিৎ নয়। যেমন করলা শীতকালে খাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই কারন করলা বা উস্তে হলো গরম কালের ফসল। আবার কচু শীতকালে খেলে শরীরে ভালোর চাইতে মন্দ হয় বেশি। অসময়ে কৃষি নিয়ে কৃষিক্ষেত্রে বিখ্যাত বাউল সাধক লালন-এর একটা গান খুব প্রযোজ্য। গানটি সময় গেলে সাধন হবে না গানের অংশ বিশেষ-"অসময়ে কৃষি করে মিছা মিছি খেঁটে মরে- গাছ যদিও হয় বীজের জোরে ফল তাতে ধরেনা তাতে ফল ধরেনা, সময় গেলে সাধন হবে না।

যদিও এক মৌসুমের ফসল আরেক মৌসুমে করা উচিৎ নয়। তথাপি কিছু ফসল আছে যে এখন সারাবছর লাভজনকভাবে ফলানো যায়। যা মৌসুম নিরপেক্ষ ফসল বা বারমাসি ফসল হয়ে গেছে যেমন-লালশাক, ডাটা, বেগুন, মরিচ, পেঁপে, লাউ, মিষ্টিকুমড়া, কলা ইত্যাদি। এছাড়াও বিশেষ পদ্ধতিতে টমেটো, পালংশাক এবং পেঁয়াজ গ্রীষ্মকালে পলিথিন সেডের নীচে করা যাচ্ছে। তবে তিনটি মৌসুম শুরুর আগে বীজতলায় কিছু কিছু সবজির আগাম চারা তৈরি করে আগরভাবে ফসল উৎপাদনে কোন বাঁধা নেই।

১৪তম পাঠ

ফসলের মাঠে জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কাজ

১৪. (ক) মাঠে সকল প্রাণির নিরাপদ আবাস স্থল গড়ে তোলা: ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং-এ সরাসরি কীট পতঙ্গ, পশু-পাখি নিধন করার কোন সুযোগ নেই। সকল জীব-জন্তুর জন্য অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারলে সেটা ক্ষতিকর পোকা-মাকড়ের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এখানে উপকারী পোকা-মাকড়ের ভয়ে ক্ষতিকর পোকা-মাকড় পালিয়ে যায় কিংবা তারা উপকারী পোকা-মাকড় এবং পশু-পাখির আহাড়ে পরিণত হয়। আসলে সকল সৃষ্টিরই কিছু না কিছু দেয়ার ক্ষমতা রয়েছে, তাই সকলে যাতে নিরাপদে বসবাস করতে পারে সে চেষ্টা করতে হবে। সাপ থাকলে যাতে সেখানে ব্যাঙ ও ইঁদুর থাকে, আবার ব্যাঙ থাকলে যেন মশা বা আরও ক্ষুদ্র পোকা থাকে। কারন খাদ্যচক্রে একে অপরকে খেয়ে বেঁচে থাকে।

১৪. (খ) মাঠে জলাধার তৈরি: ইকোলোজিক্যাল চাষাবাদে সাধারণতঃ মাটি তৈরি হয়ে গেলে তেমন পানি দরকার নেই। কিন্তু যদি পানি ব্যবহারের প্রয়োজন হয় তাহলে সংরক্ষিত (সারফেস) পানি ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়াও সংরক্ষিত জলাধারে অনেক উপকারি জীবের বসবাস শুরু হয়। যেমন-ব্যাঙাচি, ব্যাঙ, সাপ ইত্যাদি।

১৪. (গ) ফসলের ক্ষেতে নালা বা ড্রেইন তৈরি: ফসলে যেমন পানির প্রয়োজন আছে তেমনি অতিরিক্ত পানি ফসলের ক্ষতি করে। সেজন্য মাঠের ঢালু পাশে একটা বড় মাষ্টার ড্রেইন থাকবে এবং তার সাথে সংযোগ হিসেবে কিছু ফিডার ড্রেইন থাকবে। যেগুলি দিয়ে অতিরিক্ত পানি গড়িয়ে মাষ্টার ড্রেইনে যাবে এবং মাঠের পানি সহজে নিস্কাশিত হবে।

১৪. (ঘ) মাঠে বড় বট গাছ, পাকুড় গাছ/ ডুমুর গাছ থাকা প্রয়োজন: প্রতিটি শস্য মাঠে অন্তত পক্ষে দু-তিনটা বট গাছ, পাকুড় গাছ, ডুমুর গাছ বা জাম গাছ রাখা জরুরী। এইসব গাছের ফল পাখিদের কাছে খুবই প্রিয়, খাবারের লোভে পাখিরা এই সকল গাছে আসে এবং বাসা বাঁধে। যখন ঐ সব গাছে ফল থাকে না তখন পাখিরা আশে-পাশের জমিতে নেমে ফসলের পোকা-মাকড় খেয়ে কৃষকের উপকার করে।

১৫তম পাঠ

ফসলে জৈব উদ্দীপকের ব্যবহার

আজকাল বাজারে ফল-ফসলের জন্য জৈব উদ্দীপকের নামে সিনথেটিক গ্রথ হরমোন ব্যবহার করা হচ্ছে যা মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর। এই সিনথেটিক গ্রথ হরমোনের পরিবর্তে নিজেরাও বিভিন্ন জৈব উদ্দীপক ঘরেই বানানো যায়। ফসলে কখনও উদ্দীপক ব্যবহার করার প্রয়োজন হলে সজিনা পাতার নির্যাস, কেঁচোর এনজাইম বা তরল নির্যাস, দেশীয় গাভীর গো-মূত্র (১৪ দিন পঁচানো) ব্যবহার, বিভিন্ন লিগুম জাতীয় ফসল/গাছের পাতা দিয়ে তরল সার ব্যবহার, ঝুনা নারিকেলের পানি ব্যবহার, টক দই/ মাঠা ব্যবহার করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। আমরা দেশীয় গাভীর গো-চনা দিয়ে ফলিয়ার তৈরির নিয়ম আগেই জেনেছি। এখন তাই সহজলভ্য হিসেবে সজিনা পাতা ও ঝুনা নারিকেলের ব্যবহার জানবো।

১৫.ক. সজিনা পাতার জৈব উদ্দীপক তৈরি ও ব্যবহার:

সজিনা পাতায় উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য ২২ প্রকার বিভিন্ন এনজাইম, মিনারেলস বিদ্যমান। এ কারনে কৃষিতে সজিনা পাতার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাকৃতিক জৈব উদ্দীপক এবং বালাইনাশক হিসেবে সজিনা পাতার রসের ভূমিকা রয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত। ইকোলোজিক্যালভাবে ফসল উৎপাদনের জন্য এই উদ্ভিদ বৃদ্ধিকারক হরমোন খুবই কার্যকরী এবং কৃষক নিজেই বানাতে পারবে।

সজিনা পাতা দিয়ে উদ্ভিদ বৃদ্ধিকারক হরমোন তৈরির পদ্ধতি:

উপকরণ:

ক) ৪০ দিন বয়সী সজিনার পাতা

খ) পাটা-পুঁতা বা ব্লেন্ডার

গ) পরিস্কার পানি

প্রত্যুষে ৪০ দিন বয়সী সজিনা পাতা সংগ্রহ করে পাটা-পুঁতায় পিষে নিতে হবে অথবা ব্লেন্ডারে দিয়ে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। অতঃপর তাতে ২ লিটার পানি মিশিয়ে একটি দ্রবণ তৈরি করতে হবে। দ্রবণটি ৪° ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রায় ১ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। ব্যবহারের সময় দ্রবণটি ভালোভাবে ছেঁকে নিতে হবে।

প্রয়োগ পদ্ধতি:

১ লিটার সজিনা পাতার দ্রবণের সাথে ২০ লিটার পানি মিশিয়ে গাছ-পালা এবং মাটিতে স্প্রে করা যায়।

উৎপাদন বাড়াতে সপ্তাহে ১ বার ব্যবহার করা যাবে। ইহার কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।

সজিনা পাতা ব্যবহারের উপকার:

ক. শিশু গাছ-পালা দ্রুত বৃদ্ধি করে;

খ. গাছ-পালাকে দৃঢ় করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়;

গ. গাছের জীবনকাল বৃদ্ধি করে;

ঘ. অধিক হারে শিকড়, ডাল-পালা এবং পাতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে;

ঙ. অধিক ফল উৎপাদনে সহায়তা করে এবং ফলন বৃদ্ধি পায়;

চ. ফল আকারে বড় হয়।

সজনে পাতা দিয়ে জৈব উদ্দীপক তৈরি

১৫.খ. ঝুনা নারিকেলের ব্যবহার: যে কোন ফসল তুলবার ২ মাস আগে ঝুনা নারিকেলের ১ লিটার পানির সাথে ১০০ লিটার নদী বা পুকুরের পানি মিশিয়ে (যা দূষিত হয়নি) ফসলে স্প্রে করুন এবং এই নারিকেল পানি স্প্রে করবার ১৫ দিন পর ১০ লিটার পঞ্চগব্য দ্রবণ নিয়ে ফসলে স্প্রে করতে হবে। এতে করে ফসলে প্রাকৃতিক উদ্দীপক হরমোনের কাজ হবে এবং ফসলের উৎপাদন বেড়ে যাবে।

১৫.গ. টকদই বা মাঠা: দেশী গাভীর দুধ দিয়ে টক দই বা মাঠা তৈরি করে ১ লিটার টকদইয়ের সাথে ৩০ লিটার পানি অনুপাতে মিশিয়ে ফসলে স্প্রে করলে জৈব উদ্দীপকের কাজ করে। ত্রৈ-মাসিক ফসলে তিনবার স্প্রে।

১৬তম পাঠ

ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং-এর বিধি-নিষেধ

ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং-এ প্রকৃতিকে বিরক্ত করবার সুযোগ নেই, তবে মানুষের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে সুক্ষ্মভাবে ব্যবহার করতে হবে। যাতে পরিবেশ ও প্রতিবেশের কোন ক্ষতি না হয়। আমরা ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং-এ কি করবো আর কি করবোনা তা পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। তথাপি ইকোলোজিক্যাল কৃষির কিছু বিধি নিষেধ আছে যা অবশ্যই পালনীয়। যেমন-

- ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং-এ একসাথে রাসায়নিক কৃষি আর ইকোলোজিক্যাল কৃষি চাষাবাদের কোন সুযোগ নেই;
- ফসল ফলনোর মৌসুমের বাইরে অসময়ে কোন ফসলের বীজ বপন করা যাবে না;
- পারত পক্ষে হাইব্রীড জাতের বীজ ব্যবহার না করা; জিএমও বীজের ব্যবহার সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ;
- রাসায়নিক কীটনাশক ও রাসায়নিক আগাছা নাশক কখনই ব্যবহার করা যাবে না (নিষিদ্ধ);
- প্রয়োজন না হলে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার না করা;
- ফসলের মাঠে পশু-পাখি নিধন করা যাবে না;
- জমিতে শুকনো লতা-পাতা কখনই পোঁড়ানো যাবে না;
- অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহৃত পশু-পাখির মল ব্যবহার না করা;
- মানুষ ও শুকুর ও ঘোড়ার মল ব্যবহার না করা।

১৭তম পাঠ

ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং বা পরিবেশবান্ধব কৃষির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা

সারণি: ১০

নং	ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং এর চ্যালেঞ্জসমূহ	চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার উপায়
১	কৃষক পর্যায়ে পর্যাপ্ত দেশীয় গবাদি পশুর অভাব	কৃষকের ঘরে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে দেশীয় গবাদি পশু-প্রাণির সংখ্যা বাড়াতে হবে।
২	স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার না জানা/ ব্যবহার করার অনীহা	স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারে কৃষকের মাঝে সচেতনতা তৈরি করতে হবে।
৩	খাদ্য নিরাপত্তার অজুহাত	খাদ্য নিরাপত্তা নয়, এখন মনোযোগ থাকবে নিরাপদ খাদ্যের জন্য।
৪	জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাওয়া	ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং করে পরিবেশে জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।
৫	বহুজাতিক কোম্পানির নেতিবাচক প্রচারনা	নিজেদের ঘরেই জৈব সার এবং জৈব বালাইনাশকের ফ্যাক্টরী গড়ে তুলতে হবে।
৬	সঠিক কৃষি পরামর্শকের অভাব/ কৃষকের কৃষি বিশেষজ্ঞের কাছে না যাওয়া/ রাসায়নিক কৃষি ডিলারের পরামর্শ নেয়া	কৃষকদেরকে তাদের কৃষি সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার জন্য প্রকৃত কৃষি কর্মকর্তা বা কৃষি জ্ঞানী লোকের কাছে পরামর্শ নিতে হবে।
৭	রাসায়নিক সার ও কীটনাশক খেঁকো বিদেশী বামন জাতের হাইব্রীড/ জিএম বীজ-এর আগ্রাসন	হাইব্রীড ও জিএম বীজের আগ্রাসন রোধে স্থানীয় এবং উফশী জাতের বীজ সংগ্রহ করে বপন করতে হবে।
৮	স্থানীয়জাত এবং ভালো বীজের সংকট	এখনও দেশে কিছু ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে শস্য বীজ ব্যাংক স্থাপন করেছেন। তাই কৃষককে নিজেদের বীজ নিজেদেরকেই উৎপাদন করে নিতে হবে।
৯	উৎপাদিত ইকোলোজিক্যাল ফসলের স্বীকৃতি না থাকা এবং সেজন্য ন্যায্য মূল্য না পাওয়া	ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং-এ সংযুক্ত কৃষকদের জমি ও ফসল যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অডিট করানো এবং শস্য রপ্তানি করার জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট গ্রহণ।
১০	উৎপাদিত ইকোলোজিক্যাল ফসলের পর্যাপ্ত মার্কেট না থাকা	সরকারী ও বেসরকারীভাবে ইকোলোজিক্যাল ফসলের মার্কেটকে সম্প্রসারিত করতে হবে।

১৮তম পাঠ

ফসল উত্তোলণ পূর্ব এবং ফসল উত্তোলণ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

আমাদের দেশে ফসল তোলা বা ফলানোর ক্ষেত্রে যে ফসল উত্তোলণ পূর্ব এবং ফসল উত্তোলণ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা (Pre harvest and Post Harvest Mgt.) আছে তা আমরা মানতে চাইনা এবং বাস্তবে কেউ তা অনুশীলন করিনা। আসলে Ready:o Cook বা Ready:o Eat কথাটি আমাদের মানতে হবে। না হলে প্রতিযোগিতামূলক মার্কেটে একসময় আমাদের কোন স্থান থাকবেনা। তাই খুব সংক্ষিপ্ত হলেও আমাদের এইসব বিষয়ে অনুশীলন করা দরকার।

ফসল উত্তোলণ পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপনা (Pre harvest): যেকোন ফসল তোলার ক্ষেত্রে বালাই নাশকের ব্যবহার বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে। তাছাড়া ফসলটি আমরা যথাসময়ে তুলছি কিনা তা দেখতে হবে। কারণ পরিপক্ক না হলে তোলা উচিৎ নয় আবার বেশি পরিপক্ক হতে দেওয়া যাবে না। কারন যে কোন গাছের ধর্ম বংশ বিস্তার করা, তাই বোটা ছেঁড়া জাতীয় গাছে ফল বেশি পরিপক্ক হলে তার মাঝে বীজ পোক্ত হয়ে যায় তখন গাছ তার ফলন কমে দেয়। সেজন্য বীজ পোক্ত হওয়ার আগেই আমাদের ফসল তুলতে হবে। গাছে বীজ করার জন্য ফল না রাখলে যত ফসল তুলবেন তত ফলন পাওয়া যাবে। গাছে যদি আগে-ভাগে বীজের জন্য কোন ফল পরিপক্ক হয় তবে ঐ গাছের উৎপাদনহ্রাস পাবে। ফসল উত্তোলণ পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপনায় অবশই পালনীয়-

১. ফসলে কোন জৈব বালাইনাশক বা জৈব বিষ ব্যবহার করলে তার রেসিডিউয়্যাল ইফেক্ট কতদিন সেটা জেনে বিষ প্রয়োগ বন্ধ করা;

২. বৃষ্টি বা সেচের পানিতে মাটি কর্দমাক্ত অবস্থায় ফল বা সবজি সংগ্রহ করা উচিত নয়, কারন সে সময় সবজি বা ফল সংগ্রহ করলে তাতে কাদা লাগতে পারে;

৩. কোন অপরিপক্ক ফসল তোলা যাবে না, আবার ক্ষেতে সবজি বেশি পরিপক্ক হয় সেরকম করে সবজি তোলা যাবে না। কারন উভয় ক্ষেত্রে স্বাদের তারতম্য ঘটে এবং ফসলের উৎপাদন ব্যহত হয়;

৪. তাছাড়া অধিক পরিপক্ক অবস্থায় সবজি ও ফল সংগ্রহ করলে সংগ্রহোত্তর সংরক্ষণ ক্ষমতা কমে যায়, গুনাগুন নষ্ট হয় দ্রুত পঁচে যায় এবং দুরবর্তী বাজারে পরিবহণে সমস্যা হয়;

৫. পরিপক্কতার কোন পর্যায়ে সবজি ও ফল সংগ্রহ করতে হবে তা ক্রেতা সাধারণের চাহিদা, স্থানীয় বাজার, দুরবর্তী বাজার বা রপ্তানি বাজারের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে;

৬. ঠাণ্ডা ও শুষ্ক আবহাওয়ায় সূর্যোদয়ের পূর্বে বা প্রত্যুষে ক্ষেত থেকে ফসল সংগ্রহ করা উত্তম। কারন ভোরের আবহাওয়ায় ফল ও সবজি সতেজ থাকে এবং বাতাসের আপেক্ষিক আদ্রতা অধিক থাকার কারণে সংগৃহীথ ফসলের শ্বসন ক্রিয়ায় ওজন ঘাটতি কম হবে, সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা, পরিবহণ ও বাজারজাতকরণে সুবিধা হবে;

৭. যে সকল সবজি বা মসলা সূর্যোদয়ের পরেও সংগ্রহ করলে তেমন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই সেগুলি দিনের যে কোন সময় সংগ্রহ করা যায়। যেমন- পরিপক্ক মিষ্টিকুমড়া, পেঁয়াজ, আদা, হলুদ ইত্যাদি।

৮. বোটা ছেঁড়া ফসলগুলি সপ্তাহে দু/তিনবার ছেঁড়ার ব্যবস্থা করতে হবে;

পোস্ট হার্ভেস্ট ম্যানেজমেন্ট:

বিভিন্ন প্রকার সবজি ও ফল কাঁচা বা তাজা পণ্য বিধায় সংগ্রহকালীন ও সংগ্রহত্তোর পর্যায়ে প্রতিনিয়ত প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় এগুলো হতে প্রচুর পরিমাণে পানি বের হয়ে যায়। সূর্যালোকের নীচে খোলা জায়গায় নীচে খোলা অবস্থায় রাখলে দ্রুত পানি বের হয়ে অপচয় আরও বাড়ে এবং সবজি ও ফলের গুনগতমান, সতেজতা ও ওজন কমে আর্থিক ক্ষতি বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশে বিভিন্নভাবে বাৎসরিক ফসল অপচয় হয় প্রায় ত্রিশ হাজার কোটি টাকার সমমানের। খাদ্য শস্যের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হুমকি, ঠিক তেমনি খাদ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় নিম্ন আয়ের মানুষ। সার্বিকভাবে বিঘ্নিত হয় মান ও নিরাপত্তা। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ত্রুটিপূর্ণ সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনার কারণে টমেমোতে গড়ে ৩২.৯% ক্ষতি হয়। এর মধ্যে কৃষক পর্যায়ে ৬.৯%, বেপারী পর্যায়ে ৯.১%, পাইকারী আরত পর্যায়ে ৮% এবং খুচরা বিক্রেতা পর্যায়ে ৮.৯%। তাছাড়াও খাদ্যের নিরাপত্তা ও গুনগতমানের নিশ্চয়তা সবজি ও ফসলের সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। জমি থেকে ভোক্তার নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত বিপুল পরিমাণ সবজি অপচয় হয় এবং খাদ্য অনিরাপদ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে তিন ধরণের ঝুঁকি খাদ্যের মান কমিয়ে অনিরাপদ করে তুলে। যেমন- অনুজীবিক ঝুঁকি, রাসায়নিক ঝুঁকি, রাসায়নিক-ভৌত অবকাঠামোগত ঝুঁকি।

১. ফসল তুলে কমপক্ষে তিন ধরণের গ্রেডিং করা- (ক) পোকা-মাকড় খেয়ে ফেলা এবং আঘাত প্রাপ্ত ফসলকে পৃথক করা (খ) অসম আকৃতির ফসলকে আলাদা করা (গ) একই আকার-আকৃতির ভালো চেহারার ফল-ফসলকে গ্রেড-১ হিসেবে আলাদা করা। তাহলে বাজারজাত করতে গেলে গড়ে গ্রেড-১ এর ভালো একটা দাম পাওয়া যাবে। গ্রেডিং না করলে গড় দাম কমে যাবে এবং তাতে কৃষকের লোকসান হবে;

২. জীবাণুমুক্ত ধারালো ছুঁড়ি বা কাঁচি দিয়ে ফসলের বোটা কাঁটতে হবে, কোন অবস্থায় জোড় করে খেঁতলিয়ে ছেঁড়া যাবে না। এতে করে ফলের বৃন্ত বা গাছের বাকল

ছিঁড়ে যেতে পারে। যেমন টমেটো, বেগুন, ক্যাপসিকাম, লাউ, চালকুমড়া, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গে, ধুন্দল, ঢেঁড়শ, শশা ইত্যাদি কিছুটা লম্বা বৃন্ত বা বোটা ফসল এগুলো টানা-হেছড়া করে ছেঁড়া যাবে না;

৩. সবজি বা ফল সংগ্রহের সময় বোটা আঙ্গুল দিয়ে ধরে কাঁতে হবে কোনভাবেই ফলে হাত দেয়া যাবে না, কারন তাতে সবজির রঙ নষ্ট হতে পারে এবং হাতের ছাপ পরার কারনে আর্কষণ কমে যেতে পারে;

৪. সংগ্রহের জন্য এমন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে যাতে সংগৃহীত ফল ও সবজি কোন প্রকার আঘাতপ্রাপ্ত না হয়, অবয়ব পরিচ্ছন্ন, সুন্দর এবং আকর্ষণীয় হয়, গুনগতমান ঠিক থাকে।

৫. যদি কোন ফসল রোদে শুকাতে হয় এবং ময়লা পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয় তা অবশ্যই করে নিতে হবে;

৬. ফল-ফসল সংগ্রহ করে মাটিতে এবং খোলা অবস্থায় রাখা যাবে না;

৭. ফল-ফসল সংগ্রহ করে রৌদ্রে না রাখা, কারন তাতে ফসলে গ্লেস নষ্ট হবে এবং ফসল শুকিয়ে

৮. কোন ফল বা সবজি যদি ধুতে হয় তবে ধৌত করার ক্ষেত্রে অনিরাপদ পানি বা নোংরা পানি ব্যবহার করা যাবে না, পরিস্কার পানি দিয়ে ধুতে হবে;

৯. মুছার প্রয়োজন হলে পরিস্কার নরম কাপড় দিয়ে খুব হালকাভাবে পরিস্কার করতে হবে;

১০. অনিরাপদ প্যাকেজিং মালামাল ব্যবহার না করা;

১১. সঠিকভাবে ফল-সবজি বাজারজাতকরণে মসৃন বাঁশের খাঁচা বা ক্যারেটে ভর্তি করতে হবে;

১২. ফল-ফসলকে বাজারজাতকরণে বেশি ঠাসাঠাসি না করা;

১৩. কাঁচা সবজি ফসল হলে তা বস্তায় করে বাজারজাত করা যাবে না;

১৯তম পাঠ

ফসল বাজারজাতকরণে পরিবেশবান্ধব মোড়কের ব্যবহার

গ্রেডিং করা ফল-ফসল যাতে কোন প্রকার আঘাত না পায় এবং সজীব থাকে সেজন্য আমাদের হাতের কাছে প্রচুর সবুজ লতা-পাতা আছে যা দিয়ে আমরা কাঁচা শাক-সবজি ও ফল-মূল বাজারজাত করার ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে প্যাকেজিং করতে পারি। আমাদের দেশেই এক সময় পণ্য বিপণনে কলার পাতা, শাল পাতা, পদ্ম পাতা ইত্যাদি ব্যবহার হতো কিন্তু এগুলি পলিথিনের আগাসনে হারিয়ে গেছে। তাই আবারও কলাপাতা এবং প্রাপ্যতা সাপেক্ষে শালপাতা ও পদ্ম পাতার ব্যবহার বাড়াতে হবে। কারন এগুলি দিয়ে ফল ও শাক-সবজি মুড়িয়ে বা পেঁচিয়ে দিলে সবুজ পাতার ক্লোরোফিলের কারনে সরাসরি বাতাস ও সূর্য্য তাপ থেকে পণ্য রক্ষা পায় এবং দীর্ঘসময় ফসল ও ফল সতেজ থাকে। উদাহরণ- ধুন্দল, লাউ, বেগুন, ফুলকপি, ব্রকলী, পটল, আনারস, লিচু ইত্যাদি ফল বিভিন্ন লতা-পাতা দিয়ে ঢেঁকে বাজারজাত করা যায়। এছাড়াও বিভিন্ন ফসলের উচ্ছিষ্ট লতা-পাতা এবং বুনো কিছু সবুজ লতা-পাতা দিয়েও পণ্য মুড়িয়ে বাজারজাত করলে পণ্যের সতেজতা ধরে রাখা সম্ভব হয়।

মোড়ক হিসেবে কলাপাতার ব্যবহার

২০তম পাঠ

ফসল উৎপাদন ও বিপণন হিসাব লিপিবদ্ধকরণ ছক

অনেক কৃষক ফসল উৎপাদনকে ব্যবসা হিসেবে নিয়ে থাকে। তাই ফসল উৎপাদনের ব্যয় এবং উৎপাদিত ফসল বিক্রী করে আয়ের হিসাব থাকা আবশ্যক। ফসল উৎপাদনে আয়-ব্যয়ের হিসেব করতে হলে আমাদের কত ধরণের ব্যয় হয় তা লিপিবদ্ধ করা। যেমন- জমি প্রস্তুতকরণ ব্যয়, উপকরণ ব্যয়, শ্রমিক ব্যয় এবং বাজারজাতকরণ ব্যয়।

(ক) ব্যয়ের ছক-১

কৃষকের নাম: ..... জমির পরিমাণ: ..... শতাংশ,

ফসলের নাম: ..... ফসল বপনের তারিখ: .....

নং	ব্যয়ের তারিখ	জমি প্রস্তুতকরণ ব্যয় (টাকা)	উপকরণ ব্যয় (বীজ, সার, বালাইনাশক) (টাকা)	দৈনিক শ্রমিক মজুরী ব্যয় (টাকা)	সেচের ব্যয় (টাকা)	বাজারজাতকরণ ব্যয় (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
মোট ব্যয় (টাকা)								

(খ) আয়ের ছক-২

নং	ফসল উত্তোলনের তারিখ	ফসলের পরিমাণ (কেজি)	ফসল বিক্রয় (টাকা)	ফসল থেকে মোট আয়	মন্তব্য
মোট আয় (টাকা)					

সংযুক্তি -১

বাংলাদেশে শাক সবজীর সংক্ষিপ্ত চাষ প্রণালী

নং	সবজির নাম	বীজ বপণের সময়	চারা রোপনের সময়	বীজ হার (একরে)	রোপণ পদ্ধতি	রোপন দুরত্ব (সে:মি) লাইন X গাছ
১	ফুলকপি	মধ্য শ্রাবণ-মধ্য ভাদ্র	মধ্য ভাদ্র-মধ্য আশ্বিন	১২৫-১৫০ গ্রাম	বেডে জোড়া সারি	৫০ X ৪০
		মধ্য ভাদ্র-মধ্য আশ্বিন	মধ্য আশ্বিন-কার্তিক	১০০-১২৫ গ্রাম	ঐ	৬০ X ৪৫
		মধ্য আশ্বিন-মধ্য কার্তিক	কার্তিক-অগ্রহায়ণ	১০০-১২৫ গ্রাম	ঐ	৬০ X ৬০
২	বাঁধাকপি	শ্রাবণ-ভাদ্র	ভাদ্র-আশ্বিন	১৫০-২০০ গ্রাম	ঐ	৫০ X ৪০
		আশ্বিন-কার্তিক	কার্তিক-অগ্রহায়ণ	১২৫-১৫০ গ্রাম	ঐ	৬০ X ৪৫
		অগ্রহায়ণ-মধ্য পৌষ	পৌষ-মধ্য মাঘ	১০০-১২৫ গ্রাম	ঐ	৬০ X ৫০
৩	ব্রকলী	ভাদ্র-অগ্রহায়ণ	আশ্বিন-পৌষ	১০০-১৫০ গ্রাম	ঐ	৬০ X ৪৫
৪	ওলকপি	ভাদ্র-পৌষ	আশ্বিন-মাঘ	৩০০-৪০০ গ্রাম	বেডে তিন সারি	৩০ X ২০
৫	চীনাকপি	ভাদ্র-মাঘ	আশ্বিন-ফাল্গুন	১৫০-২০০ গ্রাম	বেডে জোড়া সারি	৪৫ X ৩০
৬	পালংশাক	ভাদ্র-মাঘ	–	১২-১৫ কেজি	সারিতে বপন	২৫ X ০
৭	মূলা	ভাদ্র-আশ্বিন	–	২-৩ কেজি	বেড প্রথায় সারিতে পাতলা করে বপন	৪৫ X ১৫
৮	গাজর	আশ্বিন-পৌষ	–	১-১.২ কেজি	ঐ	২৫ X ৫
৯	টমেটো	ভাদ্র	আশ্বিন	৭০-৮০ গ্রাম	ঐ	৪৫ X ৪৫
		আশ্বিন-অগ্রহায়ণ	কার্তিক-পৌষ	৭০-৮০ গ্রাম	ঐ	৬০ X ৪৫
১০	বেগুন	শ্রাবণ-ভাদ্র	ভাদ্র-আশ্বিন	৮০-১০০ গ্রাম	ঐ	৭৫ X ৫০

নং	সবজির নাম	বীজ বপণের সময়	চারা রোপনের সময়	বীজ হার (একরে)	রোপণ পদ্ধতি	রোপন দুরত্ব (সে:মি) লাইন X গাছ
১০	বেগুন	আশ্বিন-কার্তিক	কার্তিক-অগ্রহায়ণ	৮০-১০০ গ্রাম	ঐ	৬০ X ৪৫
		মাঘ-চৈত্র	ফাল্গুন-বৈশাখ	৮০-১০০ গ্রাম	ঐ	৬০ X ৪৫
১১	মরিচ	আশ্বিন-কার্তিক	-	৭৫০-৯০০ গ্রাম	বেডে বীজ বপন	২০ X ১৫
		সারা বছর	৩০ দিনের চারা	২০০-২৫০ গ্রাম	বেডে জোড়া সারি	৬০ X ৪৫
১২	শসা	আশ্বিন-পৌষ	-	৪৫০-৫০০ গ্রাম	বেডে জোড়া সারি	৯০ X ৪৫
		ফাল্গুন-জৈষ্ঠ্য	-	২৫০-৩০০ গ্রাম	৪৫X৪৫X৪৫ সে:মি: মাদায় বপন	২৫০ X ১৫০
১৩	মিষ্টি কুমড়া	অগ্রহায়ন-পৌষ	-	৪০০-৫০০ গ্রাম	ঐ	৩০০ X ১৫০
		বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য	-	ঐ	ঐ	ঐ
১৪	লাউ	শ্রাবণ-কার্তিক ভাদ্র-কার্তিক	-	৪০০-৫০০ গ্রাম	ঐ	৩০০ X ২০০
১৫	দেশী সীম	আষাঢ়-ভাদ্র	-	৫-৭ কেজি	ঐ	২৫০ X ১৫০
১৬	করল্লা	ফাল্গুন-জৈষ্ঠ্য	চারা রোপন চলে	১-১.৫ কেজি	৪৫X৪৫X৪৫	২০০ X ২০০
১৭	চিচিংগা	ফাল্গুন-জৈষ্ঠ্য	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৮	চাল কুমড়া	ফাল্গুন-জৈষ্ঠ্য	ঐ	১৫০-২০০ গ্রাম	ঐ	ঐ
১৯	পিঁয়াজ	কার্তিক-অগ্রহায়ণ	পৌষ-মাঘ	১-১.২ কেজি	সারিতে চারা রোপন	২৫ X ১০
২০	গোল আলু	অগ্রহায়ণ	-	৬০০-৮০০ কেজি	সারিতে কন্দ রোপন	৬০ X ২০
২১	ডাঁটা	ফাল্গুন-আষাঢ়	-	১ কেজি	সারিতে ছিটিয়ে বপন	২৫ X ০
২২	মটরশুঁটি	অগ্রহায়ণ	-	১৫-২০ কেজি	সারিতে বীজ বপন	৩০ X ১০

নং	সবজির নাম	বীজ বপণের সময়	চারা রোপনের সময়	বীজ হার (একরে)	রোপণ পদ্ধতি	রোপন দুরত্ব (সেঃমি) লাইন X গাছ
২৩	ঝুপড়ি সীম	কার্তিক-অগ্রহায়ণ	–	১৫-২০ কেজি	সারিতে বীজ বপন	৪৫ X ১৫
২৪	লাল শাক	বারো মাস	–	১.৫ কেজি	সারিতে ছিটিয়ে বপন	২৫ X ০
২৫	কাঁকরোল	চৈত্র-জৈষ্ঠ্য	–	৮০০-১০০০ টি	মাদায় কন্দ রোপন	২৫ X ০
২৬	বরবটি	ফাল্গুন-ভাদ্র	–	৩-৪ কেজি	জোড়া সারি	৭৫ X ১৫
২৭	ঢেঁড়শ	ফাল্গুন-বৈশাখ ভাদ্র-আশ্বিন	–	২-৩ কেজি	সারিতে	৬০ X ৪৫
২৮	পুঁই শাক	ফাল্গুন-জৈষ্ঠ্য	৩০ দিনের চারা	৭০০-৮০০ গ্রাম	জোড়া সারি	৪৫ X ৩০
২৯	কলমী শাক	চৈত্র-শ্রাবণ	–	২-৩ কেজি	জোড়া সারি	৩০ X ১০
৩০	লেটুস	ভাদ্র-পৌষ	আশ্বিন-মাঘ	৮০-১০০ গ্রাম	জোড়া সারি	৪০ X ২০
৩১	তরমুজ	পৌষ-মাঘ	৩০ দিনের চারা	৮০-১০০ গ্রাম	৪৫X৪৫X৪৫ সেঃমিঃ মাদায় রোপন	২১০ X ১৮০
৩২	পেঁপে	মাঘ-চৈত্র	ফাল্গুন-জৈষ্ঠ্য	১০০-১৫০ গ্রাম	৪৫X৪৫X৪৫ সেঃমিঃ মাদায় ৩টি চারা	ঐ

সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি ও তথ্যসূত্র

১. STATISTA-2000

২. *Satyameve Jayate*, Episode 8, Toxic Food

৩. *The Gaia Atlas of planet Management*

৪. Bernard Declercq, 2002, *The Real Need of Plants, Organic Farming Reader*, Eds Claude Alvares et al and others India Press

৫. ক্যালট, জি ১৯৮২ *Lets Intractiones soil racevi INRA(Eds) Organic Farming Reader* (Ed Alveras Claude) OPI, Goa

৬. *Teeming with Microbes*, Jeft Lowenfels and Wayne Lewis, September 2010,Timber press)

৭. *Organic Farming Theory & Practice*, Scientific publication, Jhodpur. Palaniyappan, S P and K Annadurai 1999

৮. *The One-Straw Revolution*, Masanobu Fukuoka

৯. IFOAM Organics International

১০. *The Philosophy of Spiritual Farming part-01*, Subhash Palekar

১১. *Zero Budget Farming*, Subhash Palekar, Google, wikipedia

১২. Soil Vasu

১৩. *কৃষি ভাবনা ও দুর্ভাবনা*, অনুপম পাল

১৪. *প্রাকৃতিক কৃষির প্রাকৃতিক নিয়ম*, শহীদ আহমেদ

১৫. *ভালো থাকার অভিপ্রায়*-ভিডিও, ড. অনুপম পাল, উপসহকারি কৃষি অধিকর্তা, পুরুলিয়া, ইন্ডিয়া।

১৬. দেশীয় ধান বীজ সংরক্ষণে ইউসুফ মোল্লা ও দেশীয় বীজ সংরক্ষণে অল্পনা রানী মিস্ত্রির চেনা জানা ইউটিউব ভিডিও এবং লেখক কতৃক সরজমিন পরিদর্শন ও স্থিরচিত্র ধারণ

১৭. *প্রাকৃতিক কৃষির দর্শন*, ভরত মনসসসাতা

১৮. *জৈব সার ও কৃষি বিজ্ঞানে জীবাণুর অবদান*, শ্যামল বণিক, ১৯৮৫, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ১২৮

১৯. *জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি ম্যানুয়াল*, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ

২০. *অর্গানিক চাষাবাদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল*, মোঃ শফিকুল ইসলাম

২১. *চাষ বাস প্রতিবেশ*, অংশুমান দাশ

২২. Google, wikipedia

২৩. *কৃষি শিক্ষা*, সপ্তম শ্রেণি

২৪. কৃষি সার্ভিস সেন্টার, কলকাতা, মাদবন, এম আর এবং এস চেলহিয়া ১৯৮৬, *Influence of Inter cropping legume with sorghum on the Infestation of stem borer, in Tropical pest Management*

২৫. *ফল ও সবজি ফসল নসংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা*, ড. রতন দে, পীযুষ কান্তি সরকার, ড. এম মোস্তাক আহমেদ

২৬. *সময় গেলে সাধন হবে না*-লালন গীতি

২৭. *খনার বচন*, উইকিপিডিয়া

২৮. গ্রামীণ কৃষকদের প্রচলিত জ্ঞান চর্চা

লেখক পরিচিতি

মো. মিজানুর রহমান, লোক প্রশাসনে স্নাতকোত্তর। জন্ম ১৯৭৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায়। বাবা ছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং মা গৃহীনি। শিক্ষক পরিবারে জন্ম হলেও কৃষিকাজের সাথে সম্পর্ক ছিল নিবিড়ভাবে। কারণ পারিবারিক খাদ্য চাহিদার বেশীরভাগই পুরণ হতো নিজস্ব জমিতে উৎপাদিত কৃষি পণ্য থেকে।

পরবর্তীতে চাকুরী সূত্রে দাতা সংস্থা 'এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ'-এর অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারী সংস্থা কোস্ট ট্রাস্ট-এ Regenerative Agriculture-এর সাথে পরিচয় ও কাজ করা। এরপর ২০০৩ সালে বাংলাদেশের ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং-এর অন্যতম পথিকৃৎ ডাঃ ইকবাল আমিনুল কবীর-এর দর্শন লাভ। যিনি ছিলেন বিখ্যাত প্রাকৃতিক কৃষি দার্শনিক মাসানবু ফুকুওয়াকার সরাসরি শিষ্য। ডাঃ ইকবাল আমিনুল কবীরের সাথে পরিচয় হবার পর ২০০৪ সালে তার সাথে কাজ করতে চলে যান বাংলাদেশের একমাত্র আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অর্গানিক টি গার্ডেন 'কাজী এন্ড কাজী টি এস্টেট'-এ। আর এখানেই ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং শেখা ও ব্যবহারিক চর্চার ব্যাপক সুযোগ ঘটে। পাশাপাশি ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং বা জৈব কৃষির উপর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ লাভ করেন ও ২০১৬ সালে জৈব কৃষি চর্চা বিষয়ক ভারতের দর্শনীয় রাজ্য সিকিম এবং দার্জিলিং-এর 'মকাইবাড়ী চা বাগান' পরিদর্শন করেন।

বর্তমানে চাকুরী ছেড়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং-এর উপর 'পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'-এর অর্থায়নে পরিচালিত কয়েকটি বেসরকারী সংস্থায় পরামর্শ প্রদান করে চলেছেন এবং বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানিতে ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং চর্চায় সরাসরি নিয়োজিত আছেন। তার বর্তমান নেশা ও পেশা হলো স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং সম্প্রসারণ এবং স্থানীয় ও আঞ্চলিক কৃষিতে সহায়তা করা।

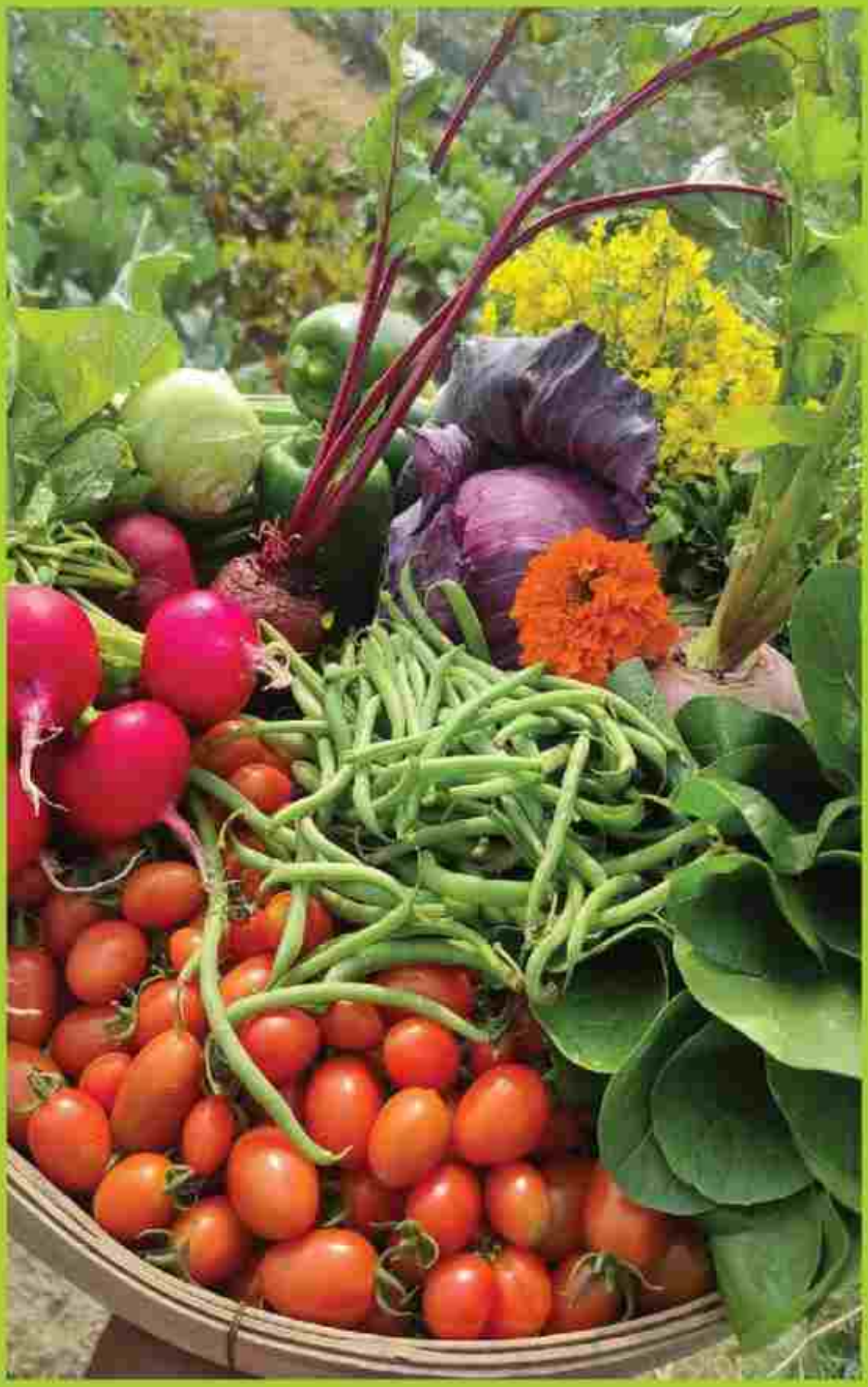

Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP)